মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকারকে কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার মীমাংসার দায়িত্ব প্রশান্ত মনে উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, ইংরাজি কথ্য-ভাষার উপর মধুসূদনের অনন্যসাধারণ অধিকারের উৎস কোথায়? ইংরাজ সমাজের আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁর উগ্র বিজাতীয় আকর্ষণের মূল কারণ কি? অত্যন্ত স্নেহশীল পিতামাতার একমাত্র সন্তান হয়ে তিনি অবলীলাক্রমে সকল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে স্বীয় সমাজ-ধর্ম ত্যাগ করলেন কোন্ মৌলিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে? কোন প্রয়োজনে তিনি সহসা কলকাতা ত্যাগ করে সুদূর মাদ্রাজে ভাগ্য অন্বেষণে গিয়েছিলেন? কি জন্য এবং কোন্ অবস্থায় তিনি রেবেকাকে ত্যাগ করে আঁরিয়েতের সঙ্গে নিজের ভাগ্য বিজড়িত করেছিলেন? এই সব অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে আমি বহুদিন যাবৎ আমার সমস্ত অবসর সময় নিয়োগ করেছি। সব ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত সমাধান করতে সমর্থ হয়েছি. সে দাবী আমি নিশ্চয় করি না। তবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এবং এ বিষয়ে দু'একজন বন্ধুও অনুকূল মত প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও এ সবই বৈঠকী আলাপের মধ্যে পর্যবসিত হত যদি না ১৯৫৯ সালের কোনও এক সময়ে 'মন্দিরা'র সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কোনও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা লেখবার জন্য আমাকে অনুরোধ না করতেন। এই অনুরোধের বশবর্তী হয়েই আমি সংগৃহীত তথ্য গ্রন্থনের কাজে হস্তক্ষেপ করি, এবং প্রায় বৎসরাধিককাল প্রতি মাসে 'মন্দিরা'য় এই রচনা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন কিছু কিছু নূতন তথ্য-যোজনায় বর্ধিত আকারে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর নিকট আমার সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করে দায়মুক্ত হলাম।

তথ্য সংকলনে এবং অন্য নানাভাবে শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহ না থাকলে আমি এ কাজ শেষ করতে পারতাম কি-না সন্দেহ।

মধুসূদনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিনি। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এসে আমার কাহিনী শেষ করেছি, কারণ উল্লিখিত সমস্যাগুলি ঐ সময়ের অন্তর্ভুক্ত। এর পরের ঘটনা সম্পর্কে কোনও জটিলতা নেই, আমারও কোন বক্তব্য নেই।

চিঠিপত্র এবং অন্য ইংরাজি রচনা থেকে উদ্ধৃতিগুলি অনুবাদ করে দিয়েছি কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে। অনুবাদ সাধ্যমত আক্ষরিক করবার চেষ্টা করেছি যাতে আমার নিজের সংস্কার প্রক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা না থাকে।

যাঁদের গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মাল-মশলা সংগ্রহ করেছি তাঁদের নিকট আমার ঋণ পুস্তকের যথাস্থানে স্বীকার করেছি। অন্যান্য ব্যবহৃত পুস্তকের যে তালিকা পরিশিষ্টে দিয়েছি সেগুলির নিকটও আমার পরোক্ষ ঋণ অল্প নয়।

'বাণী প্রেস'-এর কর্মিবৃন্দ নানা সংশোধন ও সংযোজনায় কণ্টকাকীর্ণ আমার হস্তলিপির পাঠোদ্ধারে যে নিষ্ঠা ও ধৈর্য দেখিয়েছেন তার প্রশংসা না করে পারি না। প্রকাশকও আমার সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে ইতস্ততঃ করেন নি, এজন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বক্তব্য এ বিষয়ে দীর্ঘদিন অনুশীলন করে আমার মনে এই স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদি কোনও তরুণ গবেষক প্রাচীন সংবাদপত্র, কলকাতার বনেদি ও বিদগ্ধ পরিবারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক-পুস্তিকা বা দপ্তরের কাগজপত্র, এবং কলকাতা ও মাদ্রাজের নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নথিপত্র অনুসন্ধান করেন (যা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি), তবে তিনি এখনও মাইকেল-জীবনী সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করতে ও অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হবেন। আগামী কালের এই সব অধ্যবসায়শীল গবেষকের উদ্দেশে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা আশান্বিত চিত্তে উৎসর্গ করলাম।

১লা জুন ১৯৬২
১৩।১ রিচি রোড,
কলিকাতা-১৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মাইকেল জীবনীর আদিপর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুগ-পরিচয়

(১)

ইতিহাসের বিচিত্র বিধানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎস-সন্ধানে সেই সাহিত্যের জন্মদাতা মাইকেল মধুসূদনের মানসলোক 'য়্যালবিয়ন'-এ যেতে হয়। একদা ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজ বণিক 'এলডোরাডো'র তল্লাসে পৃথিবীর দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল: সেদিন তাদের মনে ছিল নূতন জীবন-আস্বাদনের উন্মাদনা; তাদের হাতে ছিল দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের নির্ভুল নির্দেশ। তাই দুস্তর সমুদ্রের বা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের ব্যবধান তাদের নিরস্ত করতে পারেনি। সেদিন ইংরাজের এই বিজয় অভিযানের আওতা থেকে পৃথিবীর কোনও দিকই বাদ পড়েনি, এবং এরই ঝোঁকে বহু ব্যর্থপ্রয়াসের পরে, ভাস্‌কো-ডা-গামা'র আবিষ্কৃত সমুদ্র-পথ অনুসরণ করে তারা একদিন ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করেছিল—অর্মাজ ও হিন্দের ধনদৌলত* লুট করে নিয়ে যাবার লোভে। তিনশ' বছর ধরে এ কাজ যে তারা কি-ভাবে সম্পন্ন করেছিল তার কলঙ্কময় কাহিনী আমাদের অবিদিত নয়। কিন্তু সেই শোষণবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে এদের মধ্যে দু'একজন দিলদরিয়া দরদী লোক বাংলাদেশের উর্বর পলিমাটিতে এমন দু'একটি বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যা থেকে কালক্রমে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কল্পবৃক্ষ অঙ্কুরিত

---

* 'The wealth of Ormuz and of Ind',
Or where the gorgeous East with richest hand
Showers on her kings barbaric pearl and gold.'

—*Paradise Lost*, II, 3-5.

ও প্রসারিত হয়েছে। এ সাহিত্যের সহিত আমাদের আগেকার সাহিত্যের বিরাট পার্থক্য এই বিজাতীয় প্রভাবের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল—মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুপ্রেরণায়।

অবশ্য আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে এ ধরণের গবেষণা অবান্তর। ষোড়শ শতাব্দীর রাণী এলিজাবেথ কোন্ সর্তে ও স্বার্থে একটি বণিকগোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে অবাধ ও একচেটিয়া বাণিজ্য বিস্তারের সনদ দিয়েছিলেন, অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন ইংরাজ চিকিৎসক মুঘল রাজদুহিতাকে রোগমুক্ত করার পুরস্কারস্বরূপ কি কৌশলে দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে বাংলাদেশে স্বজাতির অনুকূলে ব্যবসাগত অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন; অথবা জনৈক ইংরাজ বণিক একটি ব্রাহ্মণ সতীকে প্রজ্বলিত চিতা থেকে উদ্ধার করে একই সাথে ভার্যা ও ভাগ্যলাভ করেছিলেন, এবং ভাগীরথীতীরস্থ সুতানুটি গ্রামে এই আজব সহর কলকাতার গোড়াপত্তন করেছিলেন, এই সব কাহিনীর রম্যরসাত্মক আবেদন আপাততঃ মুলতবী রেখে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে ক্ষণেকের তরে দাঁড়িয়ে তদানীন্তন ইংলণ্ডের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করব।

সেদিন রাষ্ট্রবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের মিলিত ধাক্কায় ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একটা ভিত্-বদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সদ্য-আবিষ্কৃত উৎপাদন যন্ত্রের ক্রমিক উৎকর্ষ সমাজের মৌলিক পরিবর্তনকে দ্রুততর করেছিল। এর উপর ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত ধনদৌলতের আমদানী এবং এদেশের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করেছিল। একদিকে এই নবলব্ধ ঐশ্বর্যের চাকচিক্য যেমন সে-দিনের কবিকুলের কল্পনাকে বিচিত্র রূপ-রঙে রঞ্জিত করেছিল—মেঘাচ্ছন্ন গগনপটে ঐন্দ্রজালিক আলিম্পনের মত;—তেমনি অপরদিকে এক সুগভীর মানবিক চেতনার আবেদন অনেক খ্যাত অখ্যাত কবির মনে বিপ্লবের অগ্নিশিখা রক্ত-রঙা দীপ্তিতে প্রজ্বলিত হয়েছিল, এবং অন্ততঃ

একজন কবির মনোমুকুরে এই ছবি মর্মস্পর্শী রেখায় প্রতিফলিত হয়েছিল : কীট্‌স্‌ লিখলেন—

For them many a weary band did swelt
In torchéd mines and minéd factories ;
And many once-quivered loins did melt
In blood from stinging whip ; with hollow eyes
Many all day in dazzling river stood
To take rich-ored driftings from the flood.

For them the Ceylon diver held his breath.
And went all naked to the hungry shark ;
For them ears gushed blood ;.........
......For them alone did seethe
A thousand men in troubles dark and deep.

—Keats ; ***Isabella***

মিল্‌টন্‌-কল্পিত পারস্য-ভারতের ঐশ্বর্য-নিকেতন থেকে ঔপ-নিবেশিক ভারতের এই আসমান-জমিন প্রভেদ শতাব্দীব্যাপী শোষণের নির্ভুল নিশানা।

(২)

রূপমুগ্ধ কবি কীটস্‌-এর এই স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টি সে যুগের ইংরাজি সাহিত্যের আনাচে-কানাচে অবিরল না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস্তবের রুক্ষ রূপরেখা রোম্যান্টিক কল্পনার আবেশে সমাচ্ছন্ন। আদর্শের উদ্দীপনা যেমন একদিকে কবিকে আগামী কালের পূর্ণতর জীবন-সম্ভাবনার আশায় উন্মুখ করে রাখে, তেমনি কল্পনার বাস্তববিমুখতা তাঁর এষণাকে প্রায়ই হয় অভ্রভেদী আস্ফালনে না হয় আপাত-মনোরম আকাশ কুসুম-চয়নে নিযুক্ত করে।

ইংরাজি রোম্যান্টিক কাব্যের অনুপ্রেরণা ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্রমহলে প্রবর্তিত হয়েছিল। ওয়ার্ডসোয়ার্থের আত্মনিবিষ্ট মনোময়তা, কোলরিজের স্বপ্নবিভোর কল্পনাবিলাস, বায়রণের উদ্ধত স্পর্দ্ধা, শেলীর গগনবিহারী মায়া-চঞ্চল এষণা, কীটসের আত্মবিমোহিত রূপতৃষ্ণা হিন্দু কলেজের

পড়ুয়াদের মনে সে দিন বিশেষ করে রিচার্ডসনের সম্পাদিত ইংরাজি কাব্যসংকলন* মারফত সঞ্চারিত হয়েছিল। এর পরিচয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ থেকে তরু দত্ত পর্যন্ত ইংরাজি ভাষায় লিখিত বাঙালী কবিদের রচনায় পাওয়া যায়। মধুসূদনের গোড়ার দিকের কবিতা যেমন বায়রণের ছাপ বহন করে, তেমনি তাঁর মাদ্রাজ প্রবাসে রচিত কবিতা কীটসের কল্পাশ্রিত ইন্দ্রিয়বিলাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরাজি রোম্যান্টিক কাব্যের এই প্রভাব আমাদের চিরাচরিত কাব্যরীতিকে তার আধিদৈবিক ধার্মিকতা ও আদিরসাত্মক নাগরিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমানসের আশা-নৈরাশ্যের স্পর্শে সমুজ্জ্বল করেছিল। এমন কি ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ প্রাচীন রীতির অনুবর্তকদের রচনার অন্তরালে যে ঐহিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ, দেশাত্ম মনোভাব, বা স্বপ্নবিলাসের ইন্দ্রজাল মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি দেয়, তা অনেক সময়ে এই বিদেশী প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রভাবের ফলে ক্রমশঃ আমাদের সাহিত্যিক রুচিবোধ রূপান্তরিত হয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে আমাদের এই অভিনব মানসিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষার রীতি ও ভঙ্গী প্রবর্তনের চেষ্টা আমাদের সাহিত্যকে নূতন মূল্যবোধ দিয়ে সঞ্জীবিত করেছিল। এই মহৎ সাধনায় মধুসূদনের কাব্যকে দিগ্‌দর্শিকা বললে অত্যুক্তি হয় না। আদর্শ ও অবস্থার টানে দ্বিধা-বিভক্ত কবি-মানস স্বভাবিক কারণেই রোম্যান্টিক।

(৩)

আর একদিকে আমাদের যুগচেতনার পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল উইলিয়াম জোন্‌স্‌, জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ্‌ প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত, যাঁদের প্রাচ্যপ্রীতির আন্তরিকতা সে যুগে আমাদের সংস্কৃতি

সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের ধারণার আমূল পরিবর্তন এনেছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-দর্শনকে কটাক্ষ করে মেকলের উদ্ধত সমালোচনা যেমন অর্বাচীনদের মনে স্বদেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান করেছিল, তেমনি এই সব মহাবিদ্যার্ণবদের আজীবন সাধনার প্রভাবে গোটের শকুন্তলা-প্রশস্তি কি শোপেনাহাওয়ারের আর্যদর্শনপ্রীতি বিশেষ করে নয়া-বাংলার যুগচেতনার ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করেছিল,—যে জন্য মধুসূদনের মত পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও সাজাত্য-গর্ব কখনও পরিত্যাগ করেন নি। অবশ্য একটা সুচিন্তিত বাস্তবদর্শনের অভাবে এই মানসিক দোটানা আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছিল, যে-কারণে সাধনার সংসিদ্ধি বিলম্বিত হয়েছিল।

(৪)

কিন্তু আসলে সে যুগে আসর জমিয়ে রেখেছিল কলকাতায় খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের দল। এদের মধ্যে দু'একটি অধিকতর কর্মতৎপর সম্প্রদায় সহরে হিন্দুপল্লীর কেন্দ্রস্থলে নিজেদের আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরকরণে এদের উৎসাহ এবং ছাত্রস্থানীয়দের উপর এদের প্রভাব-বিস্তার মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে রীতিমত আতঙ্ক সঞ্চার করেছিল। এর পরিচয় ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কবিতায়, কবিওয়ালাদের গানে ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে বিক্ষিপ্ত আছে। মিশনারীদের এই অবাঞ্ছিত প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা সে যুগে প্রগতিবাদীদের বিপক্ষে রক্ষণশীলদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে বিলক্ষণ সাহায্য করেছিল। ধর্মসভার কার্যকলাপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল নিশ্চয়ঃ যেমন, এদের প্ররোচনা ও প্রচেষ্টার ফলে ডিরোজিও ১৮৩১ সালে

হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন; ১৮৩৭ সালে এঁদের প্রতিবন্ধকতায় মিশনারীরা হিন্দু কলেজের সামনে গির্জা-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল; রসিক মল্লিক, দক্ষিণা মুখুজ্যে প্রভৃতি ডিরোজিওর ছাত্রদের ধর্ম-ত্যাগ থেকে নিবৃত্ত করতে এঁদের কৌটিল্যনীতি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু তবুও যুগচেতনায় কেন্দ্রস্থিতিত্বের অভাবে বিরুদ্ধবাদীর সহিত এঁদের তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঝড়ের মুখে বাঁধন ছিঁড়ে গেলে কৌশলী মাঝি-মাল্লারা নৌকাকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করবার যেমন চেষ্টা করে, এঁদের কেরামতি তার বেশী কৃতিত্ব দাবী করে না। মহেশ ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত সে যুগের হিন্দুরা ধর্মান্তর গ্রহণে বিরত থাকলেও, কলকাতার শিক্ষিত সমাজে খৃষ্টীয় সভ্যতার বীজমন্ত্র নিশ্চয় প্রবেশ করেছিল; যা ব্রাহ্মসমাজের পরিণতি ও হিন্দু সমাজের এক স্তরের আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, এই প্রভাব সহরের শিক্ষিত শ্রেণীকে অতিক্রম করে নি কোনও দিন।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন মহলে শিক্ষা বিস্তারে এইসব খৃষ্টান ধর্মযাজকদের দান অপরিসীম। এঁদের প্রচেষ্টা খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারে যতটা ব্যর্থ হয়েছিল, স্কুল-কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে ততোধিক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সদরে এঁরা গুরুর স্থান, অন্দরমহলে গোঁসাইনীর স্থান অধিকার করেছিলেন। নিজেদের ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এঁরা এতটা আস্থাবান ছিলেন যে, এঁরা মনে করতেন এ দেশে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে দেশবাসীরা স্বেচ্ছায় খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করবেন। অতএব ধর্মের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বলিষ্ঠ যুক্তিবাদ ও খৃষ্টীয় সভ্যতার

মানবিক চেতনা তাঁরা আমাদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কেরী-মার্শম্যানের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মানবপ্রীতি ধর্মীয় গোঁড়ামি অতিক্রম করে যেমন আমাদের চিত্তকে নব্য-জ্ঞানের যাদুস্পর্শে সঞ্জীবিত করেছে, তেমনি ডাফ-ডিয়্যালটি্রর আক্রমণোদ্যত তার্কিকতা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে রেখেছিল; আমাদের ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এঁরা যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন তাকে প্রতিহত করবার প্রয়োজনে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বাধ্য করেছিলেন। খৃষ্টানেরা আমাদের কূপমণ্ডূকবৃত্তি পরিহার করে বৃহত্তর জগতের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করেছিলেন। এই প্রকার যুক্তিতর্ক ব্যতীত কোনও সাহিত্যে গদ্যরীতির সমৃদ্ধি অসম্ভব। সে-যুগের প্রথম পর্বে রামমোহনের, ও দ্বিতীয় পর্বে বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতারণা আমাদের গদ্যরীতির অশেষ উন্নতি সাধন করেছে, এবং গদ্যভাষায় একটি সরল, ঋজু ও সাবলীল ভঙ্গী প্রবর্তন করেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে বঙ্গদর্শন পর্যন্ত আমাদের সাময়িক পত্রিকায় এর সপক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান। এ ধরণের যোগাযোগ সংঘটিত না হলে আমাদের সংস্কৃতি অনেকাংশে পঙ্গু ও খণ্ডিত হয়ে থাকত; বৃহত্তর পটভূমিকায় আমাদের সাহিত্য-বোধের বিস্তৃতি নিশ্চয় বিলম্বিত হত।

(৫)

খ্রীষ্টান মিশনারী ব্যতীত আমাদের সে যুগে ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এই দুই সম্প্রদায়কে স্বার্থের সমতা এককাট্টা করেছিল, এবং শাসন-ব্যবস্থা শোষণবৃত্তির অনুকূলেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ক্রমশঃ ভাল করেই বুঝতে পারলেন দেশশাসনে তাঁদের সহায়তা কত অপ্রয়োজন

এবং ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কত অবাঞ্ছিত। ইংরাজ 'নেটিব'দের সহকর্মী ও অংশীদার হিসাবে চায়নি; চেয়েছিল শুধু অনুগত মুহুরী-মুৎসুদ্দি হিসাবে। রাজানুগ্রহপুষ্ট জমিদারদের বশংবদতা চিরবিখ্যাত; তাঁরা আগেভাগে আত্মসমর্পণ করে বিদেশী শাসনের সমর্থক হয়েই রইলেন। তাই যতদিন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো মোটামুটি বজায় ছিল, ততদিন ইংরাজের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ ছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশী ব্যবসায়ীর আবির্ভাব গোলযোগ সৃষ্টি করল। তারা চাইল ইংরাজের সহিত সমপর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু সরকারী চক্রান্তের ফলে দেশী ব্যবসায়ীর জন্য ক্রমশঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হল, তারা আখেরে কোনঠাসা হয়ে রইল। দ্বারিক ঠাকুর সিল্ক্ বাকিংহামকে এদেশে এনেছিলেন ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রয়োজনে: তার মূলে ছিল ইংরাজদের সদভিপ্রায় সম্বন্ধে মোহভঙ্গ। এই ভাবে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে আমাদের রাষ্ট্রচেতনাকে মুক্তিকামী করে তুলল। এই ক্রমবর্ধমান বিরোধের ফলে শীঘ্রই দুই পক্ষের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠল। আফিসে ও হাট-বাজারে হয়ত স্বার্থের খাতিরে মেলামেশা চলত; উদ্যান-সম্মিলনের কিংবা বাগানবাড়ীর আমোদ-প্রমোদেও একটা কৃত্রিম আন্তরিকতা হয়ত দেখা যেত; কিন্তু আসলে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরূপতা একান্তই অকৃত্রিম ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতির প্রথম পর্বে ইংরাজ বণিক অর্থলোভী দেশী বণিক-গোষ্ঠীর সহযোগিতায় শোষণকার্য নির্বাহ করবার দিকেই ঝোঁক দিয়েছিল; কিন্তু বণিকের শাসন যতই এদেশের গলা টিপে ধরল, ততই সম্পর্কের নীতিগত পরিবর্তন দিনে-দিনে অনিবার্য হয়ে উঠল। এই পরিবর্তনে মেকলের দান বিশেষ করে বিশ্লেষণীয়। মেকলে ছিলেন ইংলণ্ডের নূতন ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি। তিনি তিন দিক দিয়ে ইংরেজ শাসনকে এদেশে কায়েম করেছিলেন। প্রথমতঃ,

তিনি ফৌজদারী আইনকে বিধিবদ্ধ করে ইংরাজ শাসনের বনিয়াদ পাকাপোক্ত করলেন। একশ' বছর ধরে এর দাপট আমরা অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেছি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনবদ্য সাহিত্যিক ভাষায় ইংরাজের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠতা আর ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ অধোগতি উচ্চকণ্ঠে জাহির করে আমাদের উদীয়মান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মমনোবল ভেঙ্গে দিলেন; আমরা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য কৃষ্টির তল্পিবাহকে পরিণত হলাম। তৃতীয়তঃ, তিনি শিক্ষানীতির প্রবর্তনে প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা সরকারী প্রয়োজনকে প্রাধান্য দানের ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে আমাদের মৌলিক চিত্তবৃত্তি বিকল হয়ে রইল। ডিরোজিওর প্রভাব ও প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে রইল।

(৬)

শেযোক্ত দুইটি নীতির ফলে আমাদেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলির আসল উদ্দেশ্য হল হুকুমবরদার রাজকর্মচারী ও দাস-মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি 'ভদ্রলোক' শ্রেণী সৃষ্টি করা—যারা একদিকে ইংরাজের প্রতি ভক্তিগদগদ ভাব পোষণ করবে; অপরদিকে আপামর জনসাধারণের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশে অভ্যস্ত হবে। ইংরাজি ভাষা ব্যবহারে নৈপুণ্য তাদের মধ্যে এক মারাত্মক আত্মসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের অশেষ উপকার করেছে নিশ্চয়ঃ ইংরাজি সাহিত্যের ভাবধারা, ইংরাজি রাষ্ট্রচিন্তার মুক্তিকামী আদর্শ আমাদের অন্তরে নবজীবনে প্রাণস্পন্দন সঞ্চার করেছে নিশ্চয়। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি থেকে এই সহসা কক্ষচ্যুতির ফলে আমাদের মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হল, এবং আমাদের আচার-আচরণে তা উৎকটভাবে ফুটে উঠল। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে বেমালুম আত্মসাৎ না করে তাকে অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের ধীশক্তিকে আচ্ছন্ন করে আমাদের জীবনে অশেষ দুর্গতি টেনে নিয় এল।

সেদিন দেশের অনেক মনীষী ও মনস্বী এই অন্তঃসারশূন্য অনুকরণের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। তাঁদের বোল-চাল ও হাবভাব যে কতদূর হাস্যাস্পদ ছিল তা 'নবাবাবুবিলাস'-এর চরিত্রায়ণে আজও উপভোগ্য। মধুসূদন নিজের জীবনে এর মর্মান্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাঁর পরবর্তী কালের ব্যঙ্গনাট্যে একে শ্লেষ-জর্জরিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। ভবানী বাঁড়ুয্যের 'নববাবু' থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' পর্যন্ত এই শ্রেণীর ধারাবাহিক পরিচয় আমাদের সাহিত্যে পাওয়া যায়।

(৭)

অবশ্য সর্বপ্রকার প্রচ্ছন্ন ও প্রকট প্রভাবকে অতিক্রম করেছিলেন সে-যুগের দুজন মনীষী, বিদেশী হলেও তরুণ ছাত্রদের উপর যাঁদের আধিপত্য অবিসংবাদিত ছিল। আজ দীর্ঘ শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের নাম বাংলা দেশের হৃদয়পটে আজও অম্লান হয়ে আছে। ডিরোজিও ছিলেন যাকে বলে দেবতার বরপুত্র,—এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর অকাল মৃত্যু তাঁর শিষ্যদের মনে যে গভীর বেদনা সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় দশ বৎসর পরে হেয়ার সাহেবের মৃত্যুতে কলকাতার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাস। বিদেশী হয়েও এঁরা ছিলেন আমাদের বন্ধু, আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ। এঁরা নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু এঁদের অবিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না। এঁরা সব কিছুকে যুক্তি ও মানবতার দিক দিয়ে বিচার করতেন। এই জন্য এঁদের নাস্তিকতা নয়া-বাংলার স্বাধীন মননশীলতার পরিপোষক ছিল, এবং আমাদের সামাজিক জীবনে সাংস্কারিক অনুশাসনের বন্ধনকে শিথিল করে দিয়েছিল। ডিরোজিওর নাস্তিকতা যুক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; তাই আচারপন্থীরা তাঁকে পরম শত্রু বলে মনে করত। কিন্তু হেয়ারের

নাস্তিকতা তাঁকে যথার্থই ধর্মনিরপেক্ষ করেছিল; ধর্ম সম্বন্ধে এই আন্তরিক অনাসক্তি তাঁকে সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন করেছিল।

ডিরোজিও বাংলার উত্তর-সাধকদের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, যার বহুবিস্তারিত প্রভাব তাঁদের দেশহিতৈষণা, মানবিক চেতনা, সাহিত্যিক রুচিবোধ, মার্জিত অনুভূতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিকে জীবন্ত করে তুলেছিল। তাঁরা নিজেদের ডিরোজিও-র শিষ্য বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যে, প্রতিপক্ষেরাও স্বীকার করতেন যে, ডিরোজিও-র শিষ্যেরা কর্মে ও চিন্তায় কদাচ মিথ্যা আচরণ করেন না। তাঁর প্রভাবে সে-যুগের ধুরন্ধরেরা হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকে ধিক্কার দিয়েছেন, বিদেশী শাসনকে মুক্তির পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন; ধর্মজীবনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়মান চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করেছিলেন; মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য কাব্য-বিজ্ঞান পরিবেশন করবার উদ্যোগ করেছিলেন; এক কথায় সে প্রভাব তাঁদের মননশীলতাকে সর্বতোভাবে অভিযানোন্মুখ করে তুলেছিল।

ডেভিড হেয়ারের প্রভাব ডিরোজিও অপেক্ষা দীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল। অতটা গভীর না হলেও তার ক্ষেত্র ও প্রসার আরও ব্যাপক ছিল, কারণ তিনি একাধারে ছাত্রদের উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক, ও নেতৃস্থানীয়দের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নীতি-নির্দ্ধারণে তাঁর ভূমিকার তুলনা হয় না। তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধদের সর্ব কর্মে তিনি অনুপ্রাণক ছিলেন। তাঁদের কর্মে ঐকান্তিকতা, আচার-ব্যবহারে শালীনতাবোধ, বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা, দশের কাজে সহযোগিতা, দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ—এই সব সদ্‌-গুণের তিনি উৎস ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর ছাত্রহিতৈষণা

সে যুগের প্রবাদবাক্যের মত ছিল। অথচ অনাচার শাসনে ও নিয়মতন্ত্র সংরক্ষণে তিনি ছিলেন বজ্রহস্ত।

(৮)

ডিরোজিও ও ডেভিড হেয়ারের প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় সে যুগের মনীষীদের ধারণা ও কর্মশক্তি নানা দিকে উদ্রিক্ত হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে এঁরা জ্ঞানোপার্জিকা সভাপ্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন; সর্ববিদ্যাসংগ্রহের বিপুল আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেছেন; জাতীয় পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়ে তার সূচনা করেছেন, উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রিকা সম্পাদন ও প্রচার করেছেন; ভাষা সংস্কারের কথা চিন্তা করেছেন; এমন কি প্রাচীন ধর্মের নবকলেবর কল্পনা করতেও পশ্চাৎপদ হন নি। এঁদের নানাবিধ কর্ম-প্রচেষ্টার বহু-মুখিতা আমাদের ফরাসী 'এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট'-দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ জাতীয় অদম্য জ্ঞানস্পৃহাই নব-জাগৃতির মূল প্রেরণা।

আবার এককভাবে এঁরা প্রত্যেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয় রেখে গেছেন। এঁদের পুরোধা রামগোপাল ঘোষ ইংরাজ শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন; ফৌজদারী বালাখানা থেকে তাঁর বজ্রগম্ভীর ভাষণ মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনির মত দিকে দিকে মন্দ্রিত হ'ত। অপর পক্ষে হিন্দু সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণতাকে দৃপ্তভঙ্গীতে আক্রমণ করেছিলেন রসিক মল্লিক, যিনি আদালতের সামনে গঙ্গা-জলের পবিত্রতা অস্বীকার করে সকলের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণা মুখুজ্যের দুঃসাহসিকতা তাঁর দানশীলতার মতই রোমাঞ্চকর; তিনি বর্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর আমমোক্তারী করতে গিয়ে 'গুড়গুড়ে' পণ্ডিতের সহায়তায় তাঁকে বিবাহ করেছিলেন ইংরাজের

আইনানুসারে। স্বনামধন্য রাধানাথ সিকদার শুধু মদ্যমাংসের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ক্ষান্ত হননি; সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম বন্ধুবর প্যারিচাঁদ মিত্রকে বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের পুচ্ছানুবর্তিতা থেকে উদ্ধার করে তাকে সর্বজনবোধ্য করবার মহৎকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন; রামতনু লাহিড়ী উপবীত পরিত্যাগ করলেন; তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনের ঐতিহ্য ও আদর্শ পরবর্তী দশকে পৌঁছে দিলেন: এঁদের প্রত্যেকে ছিলেন আত্মবিশ্বাসে নির্ভীক ও বেপরোয়া। এঁরাই ডিওজিওরো অনুগত মন্ত্রশিষ্য, ডেভিড হেয়ারের একান্ত অনুবর্তক। হয় ত এঁদের কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতির অভাব ছিল না; হয়ত অনেক সময়ে এঁদের কার্যকলাপকে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' বলে অভিহিত করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ অসঙ্গতি ও ব্যর্থতা সে যুগে বোধ হয় নিতান্তই অনিবার্য ছিল। বাস্তবের সহিত কল্পনার ব্যবধান রোম্যান্টিকতার মৌলিক ধর্ম। এই জন্য এই সব যুগন্ধর পুরুষেরা পথপ্রদর্শকের কাজ করলেও, নির্ভুল লক্ষ্য নির্দ্ধারণে অপারক হয়েছিলেন।

(৯)

সে দিন এই ধরণের নানা শক্তি ও ব্যক্তির সমাবেশ কলকাতার নাগরিক জীবনে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। বিরুদ্ধ মতামতের পারস্পরিক আঘাত-প্রত্যাঘাতের ঠোকাঠুকি থেকে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গৃহীকে শঙ্কিত, পথচারীকে বিপর্যস্ত করেছিল। ঘরে ঘরে তর্কা-তর্কি, সভাসমিতিতে বাদ-প্রতিবাদ, রাস্তা-ঘাটে প্রচার ও অপপ্রচারের দ্বন্দ্বকোলাহল। নব-প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ ও গালি-গালাজের চমক লাগানো ভাষার চমৎকারিত্বে সহসা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ধর্মে-কর্মে, বিলাসে-ব্যসনে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে সর্বত্র আবহাওয়া অস্থির ও

প্রমত্ত। আশার চেয়ে আশঙ্কা, পাওয়ার চেয়ে চাওয়ার নেশায় পরিবেশ চঞ্চল।

কিন্তু এই ত জীবনের লক্ষণ। এ যেন হঠাৎ মরা গাঙে বান ডেকে গেল। কানে কানে কে যেন বলে গেল এই প্লাবনের স্রোতে তরী ভাসিয়ে দিলে চাই কি অলক্ষ্যের পথে লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এ যেন বদ্ধজলার কূপমণ্ডূক সহসা স্রোতচঞ্চল মানস-সরোবরের সন্ধান পেয়ে অধীর আগ্রহে উচ্চকিত হয়ে উঠল। অজানার আহ্বানে ভয় আছে বটে, কিন্তু সম্ভাবনাও ত আছে। তাই এ ধরণের অস্পষ্ট কলগুঞ্জন একদিন উৎকর্ণ পল্লীবাসীদের কানে মহাসিন্ধুর গর্জনসঙ্কেত বলে মনে হয়েছিল। তাই শুনে সুরু হল গ্রামবাসীদের নগরাভিযানের পালা। কখনও একাকী, কখনও কাতারে কাতারে; কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ বা নৌকা বেয়ে ভাগ্য পরীক্ষার্থে এই আজব সহরে পদার্পণ করলেন। মানব-সভ্যতার অগ্রগামিতার সন্ধিস্থলে এ জাতীয় নগরাভিযান বার বার দেখা গেছে,—এ তারই একটি বৈকল্পিক প্রকাশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্ষীণ কুণ্ঠিত, উনবিংশ শতাব্দীর সাথে সাথে সেই ধারাস্রোত ক্রমশঃ শক্তিসংগ্রহ করে প্রবল প্রবাহে পরিণত হল। সেই প্রবাহের স্রোতে কলকাতায় এলেন বাংলা রেনেসাঁসের দিকপাল নেতৃবৃন্দ: মেদিনীপুরের বীরসিংহ থেকে এলেন বীরশ্রেষ্ঠ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর,—মানবতা ও মনীষার যুগ্মসম্মিলনে যাঁর প্রতিভা মুমূর্ষু সমাজে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করেছিল; বর্ধমানের অখ্যাতনামা চুপী গ্রাম থেকে এলেন বিদ্যাসাগরের সহকর্মী আমাদের গদ্যরীতির প্রবর্তক অমরকীর্তি অক্ষয়কুমার; ভূদেব ও মধুসূদনের সতীর্থ অনন্যমনা মনস্বী রাজনারায়ণ বসু এলেন জয়নগরের অন্তর্গত বোড়াল গ্রাম থেকে; জ্ঞানগরিমায় গরিষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এলেন সুরা থেকে; কৃষ্ণনগর থেকে এলেন রামতনু লাহিড়ী; চৌবেড়িয়া থেকে এলেন নটের গুরু নাট্যকার

দীনবন্ধু মিত্র; এবং আরও অনেক প্রতিভাবান যুগন্ধর পুরুষের সঙ্গে এলেন "যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে জন্মভূমি" যাঁর, সেই "দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন"—নবযুগের দ্বারপ্রান্তে আলোক-বর্তিকায় দীপশিখায় যাঁর জীবন দেদীপ্যমান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাগরদাঁড়ি

(১)

কলকাতা থেকে প্রায় এক-শ’ মাইল পূর্বদিকে কপোতাক্ষ নদীর পূর্বতটে যশোরের একটি সামান্য পল্লীগ্রাম মধুসূদনের জন্মস্থান। গ্রামটির নাম সাগরদাঁড়ি; তিনদিক বেষ্টন করে কপোতাক্ষ প্রবাহিত; ইতিহাসে অখ্যাত হলেও ঐতিহ্যে নেহাৎ অর্বাচীন নয়। প্রাচীন বংশপরিচয় থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসমন্ত্রদাতা কেশব ভারতীর বংশধর স্বনামধন্য অবিলম্ব সরস্বতী একদা এই গ্রামে বসবাস করেছিলেন।

> চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসমন্ত্রদাতা
> কেশবভারতী ছিল ঠিক যেন ধাতা।
> সাগরদাঁড়ি বাসা বটে শ্রোত্রিয় প্রধান
> ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞি হন।
> সে কেশব ভারতী সন্তান সুন্দর
> সিদ্ধপুরুষ অবিলম্ব সরস্বতী বর।

অবিলম্ব এক সময়ে প্রতাপাদিত্যের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন, এবং যশোরেশ্বরী মন্দিরে চণ্ডীপাঠের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি; মুখে মুখে অতি দ্রুত কবিতা রচনা করতে পারতেন বলে লোকে তাঁকে ‘অবিলম্ব’ নাম দিয়েছিল, এবং তদবধি এই নামেই তিনি পরিচিত। বহু সংস্কৃত শ্লোক এঁর রচিত বলে লোকমুখে প্রচলিত; তাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রতাপাদিত্যের প্রশস্তিবচন হিসাবে রচিত হয়েছিল। যশোর-খুলনার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র ঠিকই বলেছেন, ‘আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য অবিলম্ব সরস্বতীর মত কবির মুখে

অজস্র উদ্‌গীরিত কবিতারাজী একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।' প্রতাপাদিত্যের পতনের পর অবিলম্ব রাজধানী ঈশ্বরপুরী পরিত্যাগ করে সাগরদাঁড়িতে আসেন এবং ভজন-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। কপোতাক্ষ নদীর সন্নিকটে একটি বটবৃক্ষের তলে তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন পর্যন্ত তাঁর বাসস্থান, সাধন-কালীতলা এবং বুড়া শিবের ঘাট বর্তমান ছিল। হয়ত এই প্রাচীন বিগ্রহকে স্মরণ করে বহুকাল পরে গ্রামের স্বনামধন্য কবি লিখেছিলেন,—

আচার্য রূপে এই তরুপতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র ; নীরবে আবার
তারা দলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে।

কে জানে, হয়ত বিগতদিনের এই স্মরণীয় সিদ্ধপুরুষের উদ্দেশে কবি আক্ষেপ করেছিলেন—

এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে—মাতি অহঙ্কারে—
থাকিবে কি এ কীর্তি তার চিরদিন তরে ?

আজ অবিলম্বের কীর্তি-খ্যাতি বিস্মৃতপ্রায় ; তাঁর আসল নাম পর্যন্ত কেহ জানে না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেব-দেউলের যথার্থ নির্দেশ অনির্দিষ্ট কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করে। কিন্তু একথা ভুলবার নয় যে, তাঁরই বাসভূমির সন্নিকটে পরবর্তী কালের গ্রামের শ্রেষ্ঠ সন্তানের কীর্তিস্তম্ভ সগৌরবে এখনও বিরাজমান। তাই মধুসূদনের কীর্তি-কীর্তনের উপক্রমে এই স্বনামধন্য পূর্বসূরির কথা সহজেই মনে পড়ে।

(২)

অবশ্য সাগরদাঁড়ি মধুসূদনের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস নয়। তাঁদের আদি নিবাস ছিল যশোরের অন্তর্ভুক্ত 'বটগ্রামে'। বটগ্রামী দত্তেরা কাশ্যপ-গোত্রীয়। মধুসূদন চিরদিন বংশ-গৌরব সম্বন্ধে

অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন, এবং 'দত্ত কারও ভৃত্য নয়' এই প্রবাদবাক্য কখনও গর্বের সহিত, কখনও পরিহাসছলে উচ্চারণ করতে ভালবাসতেন। একদা এই বংশের একটি শাখা খুলনা জেলায় এসে তালাগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে এরই একটি প্রশাখা তালা পরিত্যাগ করে সাগরদাঁড়িতে তাঁদের মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দায়ভাগ-ব্যবস্থার অন্তর্গত বাংলাদেশের অনেক খণ্ডিত সম্পত্তির ক্ষুদ্র অংশীদার বংশ-পরম্পরায় বিষয়-আশয়ের পৌনঃপুনিক ভাগবাটোয়ারার ফলে সাতপুরুষের ভিটার মায়া কাটিয়ে স্থানান্তর-গমনে বাধ্য হতেন। সম্ভবতঃ এই ধরণের কোনও একটি কারণের বশবর্তী হয়ে মধুসূদনের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত সাগরদাঁড়িতে এসেছিলেন। যদিও তিনি মাতামহের সম্পত্তি পেয়েছিলেন বলে কোনও উল্লেখ নেই, তবুও নিশ্চয় তাঁর সহায়তায় রামকিশোর অনতিবিলম্বে গ্রামে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রামকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র রামনিধির চার পুত্র। সকলেই জীবনে কৃতী হয়েছিলেন। তদানীন্তন কালের সরকারী ভাষা ফারসীতে তাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন। প্রথম তিন-জনের মধ্যে একজন যশোরের আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন; দ্বিতীয়টি মুন্সেফ, ও তৃতীয়টি উকিল ছিলেন। ইংরাজ শাসকের নিকট এঁদের যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্প্রীতি ছিল। এঁদের আমলেই দত্তেরা সাগরদাঁড়ির বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। আচার-ব্যবহারে এঁরা প্রাচীন সংস্কৃতি ও ভাব-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এঁদের গৃহে সারা বৎসর যাকে বলে 'বার মাসে তের পার্বণ' লেগেই থাকত। মধুসূদনের বাল্যজীবন এই সব পূজা ও মাঙ্গলিক ব্রত-অনুষ্ঠানের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল, এবং এর ঔপচারিক সৌন্দর্য তাঁর মর্মসচেতন মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাঁর মনে এই স্মৃতিরেখা কখনও ম্লান হয়নি।

(৩)

রামনিধির কনিষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ মধুসূদনের পিতা। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন গ্রামের পাঠশালা ও মক্তবে; ফারসী ভাষায় তাঁর অসামান্য অধিকারের জন্য তিনি কালে 'মুন্সী' রাজনারায়ণ নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে যখন কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি সহরে এসে এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। অতএব কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে তিনি অন্যতম। অবশ্য তখনও হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈপ্লবিক প্রভাব অনুভূত হয় নি। এখানে তিনি ইংরাজি ভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, যে পরবর্তী কালে 'পীনাল কোড' প্রণয়নের সময়ে লর্ড মেকলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর ইংরাজির প্রশংসা করেছিলেন। একটু চিন্তা করলেই মনে হবে রিচার্ডসনের পঠনভঙ্গীর সুখ্যাতি অপেক্ষা মেকলের এ সুখ্যাতির মূল্য অনেক বেশী।

রাজনারায়ণ শিক্ষা সমাপনান্তে কলকাতার সদর আদালতে আইন-ব্যবসা সুরু করেন। ব্রিটিশ আইনের মহিমায় প্রত্যেক জমিদার অল্পবিস্তর মামলাবাজ হতে বাধ্য হত। এই জন্য দেখা যায় প্রত্যেক জমিদার-পরিবারের অন্ততঃ একজন ওকালতি ব্যবসা অবলম্বন করার একটা রেওয়াজ ছিল। যশোরের আদালতের সহিত রাজনারায়ণের দুইজন ভ্রাতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতএব কলকাতার আপীল কোর্টে নিজেদের মামলার তদারকীর সুবিধার জন্যই কনিষ্ঠ সদর আদালতে যোগ দিলেন। সে সময়ে ফ্রেড্রিক হ্যালিডে আদালতের রেজিষ্ট্রার। পরবর্তী কালে মধুসূদনের দুর্দিনে ইনি কবিকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিলেন। ওকালতিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে রাজনারায়ণের বিশেষ সময় লাগেনি।

ব্যবসার প্রয়োজনে রাজনারায়ণ খিদীরপুরে বাসা ভাড়া করেছিলেন; জলপথে যাতায়াতের দিনে সম্ভবতঃ এখানে দেশোয়ারী

লোকের অভাব ছিল না। সেকালে খিদীরপুরের মর্যাদা খাস কলকাতা থেকে কিছু কম ছিল না। এখানে এক সময়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ও প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ স্যর উলিয়াম জোন্‌স্‌ বসবাস করতেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে দেশী-বিদেশী অনেক গণ্যমান্য লোকের যাতায়াত ছিল। খিদীরপুরে রাজনারায়ণের আগমন অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। তিনি যাঁদের কাছে বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশ বাঁড়ুয্যের পিতা গিরীশচন্দ্র; কবি রঙ্গলালের মাতুল রামকমল মুখুজ্যে; ও ভূকৈলাসের বিখ্যাত জমিদারেরা। কলকাতার সহরতলী হলেও খিদীরপুরের সামাজিক জীবনে চাঞ্চল্যের অভাব ছিল না। এর একটা বিশেষ কারণ এই সময়ে এই অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষের মধ্যে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতা। তাঁরা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং অন্য নানা ভাবে নিপীড়িতদের সহায়তা করে তাদের ধর্মান্তর গ্রহণে প্ররোচিত করতেন। এঁদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে ভূকৈলাসের জমিদারের সমাজপাতিত্বে হিন্দুধর্মকে সুরক্ষিত করবার অবিরাম চেষ্টা চলত। অর্থাৎ সমসাময়িক কলকাতার সামাজিক দ্বন্দ্বের তরঙ্গভঙ্গ খিদীরপুরকেও চঞ্চল করেছিল। ঘোষালদের বৈঠকখানায় এইসব দৈনিক আলোচনায় রাজনারায়ণ নিশ্চয় যোগ দিতেন।

রাজনারায়ণ দত্তের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য। তবে প্রতিভাময় পুত্রের প্রতি তাঁর আচরণ অনুধাবন করলে তাঁর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। তিনি আচারে-বিচারে প্রাচীনপন্থী হলেও, আচরণে নিশ্চয় প্রগতিশীল ছিলেন। প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি শেষাবধি অবিচ্ছিন্ন ছিল। অন্য পাঁচজন বিত্তশালী জমিদারের মতন ঐহিক জীবনে ষড়্‌রিপু সংহারে অসমর্থ হলেও, পারলৌকিক মোক্ষলাভের আশায় মহামায়ার পূজায় পশু-সংহার করে প্রতিকী সান্ত্বনালাভের চেষ্টা তাঁর কারও

অপেক্ষা কম ছিল না। রাজনারায়ণের সৎকাজে দানধ্যান সম্পর্কে কোনও নজির বা জনশ্রুতি নেই। কিন্তু নিজে ভোগ-বিলাসে তিনি মুক্ত হস্ত না হলে পুত্রের বিলাসব্যসনে অতটা অকৃপণ নিশ্চয় হতেন না। ওদিকে কলকাতার প্রগতিবাদী নেতাদের সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। হিন্দু কলেজে শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ তিনি নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন। জীবনচর্যায় এই অসমন্বিত দ্বিমুখিতা তাঁকে কখনও আত্মসংস্থ হতে দেয় নি। এর ফলে প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করবার শক্তি তাঁর আদৌ ছিল না। তাই জীবনে যতটা জেদ ছিল ততটা জোর কোনও দিন হয়নি। এই ধরণের চিত্ত-বিকলতা দেখা গিয়েছিল পাশ্চাত্য জগতে রেণেসাঁস-এর সময়ে।

কিন্তু এ-সব স্বীকার করেও রাজনারায়ণ একটি কারণে আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি পুত্রকে পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জনের সর্বপ্রকার সুবিধা-সুযোগ দিয়েছিলেন; মদের নেশার সঙ্গে একটা আদর্শের নেশা তাঁর মনে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। হয়ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি সামাজিক কূপমণ্ডূকতাকে অতিক্রম করে নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, নূতন জগতের সম্ভাবনায় তাঁর মন সাড়া দিয়েছিল। হয়ত সেইজন্য তিনি চেয়েছিলেন পুত্র যেন প্রগতিশীলতার মুক্তস্রোতে অবগাহন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। পিতার নিকট এই মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষালাভ না করলে মধুসূদন তাঁর অগ্রবর্তী ঈশ্বর গুপ্ত বা সমসাময়িক মধুকিন্নরের পর্যায় অতিক্রম করতে পারতেন কি-না সন্দেহ। বাংলা-সাহিত্যের সংস্কার হয়েছিল মধুসূদনের পরে, আগে নয়।

(৪)

সাগরদাঁড়ির দক্ষিণে—কপোতাক্ষ নদীর তীরে কাঠিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা জাহ্নবী দেবীর সহিত

রাজনারায়ণের বিবাহ হয়। কৌলিন্যে এবং ঐশ্বর্যে মধুসূদনের মাতুলবংশের সারা যশোরে নামডাক ছিল। তাঁরা সেকালে গ্রামে চৌঘুড়ী হাঁকাতেন; তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত এমন কথাও লোকে বলত। পিতৃবংশের ও মাতৃবংশের ঐশ্বর্যের মধ্যে মধুসূদনের শিশুকাল অতিবাহিত হয়েছিল। মিতব্যয়িতার প্রয়োজন সম্বন্ধে শৈশব থেকে কোনও ধারণা করবার সুযোগ তাঁর কোনও দিন হয় নি,—এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এঁরা যেমন টাকা রোজগার করতেন, তেমনি খরচ করতেও জানতেন। এঁরা যুগসন্ধির মানুষ: বুর্জোয়া সমাজের ধনসংগ্রহের উন্মাদনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সামন্তগোষ্ঠীর টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার প্রবৃত্তি। মধুসূদন হিসাবী হতে শিখবেন কোথা থেকে?

জাহ্নবী দেবী সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি যে অমিতাচারী স্বামীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আজীবন আকর্ষণ করেছিলেন এটা তাঁর চারিত্রিক অনন্যতার নির্ভুল সঙ্কেত। পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না; এই আতিশয্যের জন্য অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছেন। মায়ের সম্বন্ধে মধুসূদন বাক্যে কি কাব্যে পরবর্তী কালে বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁর মনে রোম্যাণ্টিকতার আবেশ অবশ্য ছিল, কিন্তু আত্মপ্রচারের রোম্যাণ্টিক এষণা তাঁর ছিল না। শুধু একবার যেন চাপা ক্রন্দনের মত তাঁর অন্তরের আকূতি মর্মস্পর্শী ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল একটি 'সনেট'-এ:

—দেহ দেখা পুনঃ পূজি পা দুখানি
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
মা আমার!

এই সরল নিরাভরণ নিরলঙ্কার আত্মনিবেদনের ভাষা আন্তরিকতায় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। জাহ্নবী দেবী বাঙালী মায়ের মতই সকলের প্রতি অজস্র স্নেহধারায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। মাতৃহীন কবি

রঙ্গলালের মতন পাড়ার অনেকেই তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন। মধুসূদন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

(৫)

সাগরদাঁড়িতে ২৫শে জানুয়ারী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতামাতার জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত সন্তান। তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ আর দুটি ভ্রাতার বাল্যকালেই মৃত্যু হয়েছিল। এইজন্য তিনি পিতামাতার স্নেহ অতিরিক্ত মাত্রায় পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকারেরা মনে করেন তাঁর জীবনের পরিণতির জন্য এই স্নেহের আতিশয্যই দায়ী। কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন।

মধুসূদনের বাল্যজীবন সম্পর্কে তথ্যের একান্ত অভাবের জন্য আজ ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের জাতিগত অনাগ্রহ আমাদের লৌকিক জীবনের প্রতি চিরদিন নিরাসক্ত করেছে। মধুসূদনের বেলায় এর উপর আর একটি কারণ সংযুক্ত হওয়াতে তাঁর জীবনের আদিপর্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। ধর্মান্তর গ্রহণের দরুণ তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন, যার ফলে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করেও তাঁর বাল্যস্মৃতি সংরক্ষণের আবশ্যকতা আছে বলে তাঁরা মনে করেন নি। অতএব কালপ্রবাহে যতটুকু লোকস্মৃতির আনাচে-কানাচে থিতিয়ে ছিল, আজ তাই আমাদের সম্বল।

মধুসূদনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রামের গুরুমহাশয়ের নিকট জমিদার বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় সমারোহ সহকারে আরম্ভ হয়েছিল। লেখাপড়ার প্রতি বাল্যকালে তাঁর গভীর অভিনিবেশ সকলেই লক্ষ্য করেছিলেন। সহপাঠীদের সকলকে সর্ববিষয়ে অতিক্রম করে শীর্ষস্থান অধিকার করবার বাসনা তাঁকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। পাঠশালায় সকলের আগে পৌঁছাবার জন্য তাঁর নাওয়া-খাওয়ার তর সইত না। অবশ্য পরবর্তী কালে হিন্দুকলেজে এই নেশার উত্তেজনা অনেকটা স্তিমিত হয়েছিল। গ্রামের ছেলে লেখাপড়া শিখে

গাড়ী-ঘোড়া চড়বার স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক; কিন্তু হিন্দু কলেজে নবজাগৃতির নূতন নেশার ঘোরে মধুসূদন যে স্বপ্ন দেখতেন সেখানে গাড়ীঘোড়া চলে না,—চলে শুধু কল্পনার পুষ্পকরথ অথবা পক্ষীরাজ ঘোড়া 'পেগেসাস্'।

সেকালের পাঠশালার অধীতব্য বিষয়গুলি তিনি সহজেই আয়ত্ত করেছিলেন। সাগরদাঁড়ির পাশেই ছিল সেখ্পাড়া: সেখান থেকে গ্রামের মৌলবী আসতেন ফারসী শেখাতে। তখনও ইংরাজি সরকারী ভাষার পদমর্যাদা পায় নি। তবুও এই পাঠশালাতেই ইংরাজি শব্দসংগ্রহের গোড়া পত্তন হয়েছিল—নিশ্চয় সেকালের কৌতুকাবহ রীতি অনুসারে। অর্থাৎ পড়ুয়ারা সুর করে নামতা পড়ার মতন মুখস্ত করত—

Day মানে দিন, Night মানে রাত,
Week কে সপ্তাহ বলে, rice মানে ভাত।
Pumpkin লাউকুমড়া, cucumber শসা,
Brinjal বার্তাকু, আর ploughman চাষা।

সেকালের বহুপূর্ব থেকেই বৈষয়িক কার্যের প্রয়োজনে ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য কবির আসল শিক্ষা তাঁর মায়ের কাছে আর পল্লী-পরিবেশের স্বাভাবিক প্রভাবেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। জননীর কাছে তিনি বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি শৈশবকাল থেকে শুনতে ও পড়তে ভালবাসতেন। সে স্মৃতি তাঁর মানসপটে চিরকাল অম্লান ছিল:

মোছে তারে হেন কার আছে গো শকতি
যতদিন ভ্রমি আমি এ ভবমণ্ডলে।

পরবর্তী কালে এই সব পৌরাণিক কাহিনী প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে—হয় আখ্যানে না-হয় অলঙ্করণে—তাঁর কাব্য-কলাকে সমৃদ্ধ করেছে। এর ভাবমাধুর্য তাঁর কবিতায় চিরদিন রসসৃষ্টি

করেছে এবং প্রবাসের দুর্দিনে এই স্মৃতি নানা বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর চিত্তের সরসতা রক্ষা করেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়া ছিল। কবে বাংলার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদীয় অর্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদী কেমন কুল্‌কুল্‌ করিয়া বহিয়া যায়, কোন ঘাটে ঈশ্বর পাটনী খেয়া দিয়াছিল—সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া···তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন।" বাস্তবিক অতীতের অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলিই কাব্যের মৌলিক উপাদান। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলতেন, প্রশান্তমনে আবেগের স্মৃতিচর্যাই কাব্য। কবির মর্মসচেতন মনে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-প্রসূত অনুভূতি যে রেখাপাত করে, তা-ই কল্পনার বর্ণানুলেপনে রঞ্জিত হয়ে এবং বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ছন্দোবদ্ধ কাব্যে রূপান্তরিত হয়। এই জন্য কবির লৌকিক জীবনের পরিপূরক তাঁর কাব্য।

পল্লীপ্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যের মাঝে কবির শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিল এবং তাঁর সুকুমার মন প্রকৃতির এই সূক্ষ্ম প্রভাব রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছিল; তাঁরই ভাষায় বলা যায়—"এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, আর কোনও স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" এই ত তাঁর কাব্য-জীবনের একটা বড় ঘটনা। বাংলার তরুরাজী, শ্যামল প্রান্তর, স্রোতস্বিনী নদী, মেঘমেদুর গগনপট তিনি বারবার স্মরণ করেছেন, তার সৌন্দর্যে তাঁর কল্পনা মনের আনন্দে বিহার করেছে। প্রকৃতি পরিচর্যা ইংরাজি রোম্যান্টিক কাব্যের অন্তরের সাধনা। কিন্তু সে কাব্যের মূল প্রেরণা প্রকৃতির সৌন্দর্য যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকৃতির রহস্যঘন আবেশ, যার স্পর্শে সুন্দরের রূপরেখা হয় মায়াময়। যৌবনে মধুসূদন ইংরাজি রোম্যান্টিক কাব্যের অনুপ্রেরণা ও আবেগ অনুভব করেছিলেন; তাঁর গুরু

ছিলেন জাত রোম্যান্টিক কবি রিচার্ডসন। কিন্তু যে-প্রকৃতি তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে সে ইংরাজি রোম্যান্টিক কাব্যের স্বপ্নাবিষ্ট রহস্যময় প্রকৃতি নয়; সে নিতান্তই সাগরদাঁড়ির স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম পল্লীদৃশ্য। মধুসূদনের পল্লীজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার সার নির্যাস এই প্রকৃতি-পরিচয়ের কাব্যিক রূপান্তরে অবধৃত।

এইভাবে বাল্যকালে মধুসূদন দেশের ঐতিহ্য, গ্রামের শ্যামল শোভা, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ-ভালবাসা উপভোগ করেছিলেন এবং চিরদিন এ তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়েছিল। তিনি বিদেশী সাহিত্য থেকে যা সযত্নে সংগ্রহ করেছিলেন, তা তাঁর কাব্যের অঙ্গসজ্জায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের মর্মস্থলে বাংলার পল্লীশ্রীর মধুরতা তিনি একান্ত মনে কামনা করেছেন: তাই নির্বাসনে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করেছেন:

হৃদয়মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা-পায়,
থাক বঙ্গ গৃহে, যথা, মানসে, মা হাসে
চিররুচি কোকনদে।

(৬)

মধুসূদনের বাল্যজীবনের একটি কাহিনী কালপ্রবাহে ভেসে এসেছে—বোধ হয় তাঁর জীবনের প্রতীকী হিসাবে। শোনা যায় একদিন এক ভায়ের মনোরঞ্জনের জন্য একটি অতিপ্রিয় পোষা পাখীকে তিনি অবলীলাক্রমে স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ যেন এক ঝলক বিদ্যুতের আলোকে আগামীকালের দিগন্তপ্রসারিত অন্ধকার মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হল। ক্ষণিকের তরে যেন ভাগ্যদেবী মহাকালের অবগুণ্ঠনকে অপসৃত করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, এ বালক আবেগের বশে কোনও বন্ধনকে ছিন্ন করতে কুণ্ঠিত হবে না। স্বভাবের মৌলিক স্নেহ-মমতার অন্তরালে

লুক্কায়িত একখানি শাণিত ছুরিকা যেন নিষ্ঠুর দীপ্তিতে নিমেষের জন্য ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল।

* * * *

একটা কথা স্মরণ করে বিস্ময় লাগে। সে যুগে একজন জনপ্রিয় কবি ও গায়ক কিন্নরকণ্ঠ মধুকান নিতান্তই মধুসূদনের সমসাময়িক ছিলেন। যে সাংস্কৃতিক-পরিবেশ থেকে ঢপ-কীর্তনের উদ্ভব ও প্রসার, তারই মাঝে মধুসূদনের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি নিজে সখী-সংবাদ গাইতে ভালবাসতেন। আমাদের পল্লীগ্রামের ঢলঢল বিগলিত রসতারল্যে তাঁর শিশুমন সিঞ্চিত ও অভিষিক্ত হয়েছিল। অথচ পরিণতিতে কিন্নরকণ্ঠ মধুকানের সহিত বজ্রকণ্ঠ মধুসূদনের কি বিরাট পার্থক্য। মধুকান যে সময়ে ঢপকীর্তনের নূতন সুর ও ঢঙে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতাকে ভাবে বিহ্বল ও আনন্দে আত্মহারা করে তুলেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে সহরের নব্যকৃষ্টিসম্পন্ন সুধীসমাজকে এক অভিনব কাব্যরীতির বীরব্যঞ্জনা ও স্বরগাম্ভীর্যে মধুসূদন দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত করে-ছিলেন। এই পার্থক্যের মূলে ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষা-দীক্ষা,—যার মন্ত্রগুরু হেনরি লুই ডিরোজিও, আর অগ্নিহোত্রী ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খিদীরপুর

(১)

খিদীরপুরে এসে রাজনারায়ণ দত্ত ভূকৈলাসের জমিদারদের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে তৎপর হলেন। এই পরিবারের কর্তা কালীশঙ্কর ঘোষাল দান-ধ্যান ও ধর্মে-কর্মে পিতা জয়গোপালের উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। পিতা কাশীবাসী হওয়ার পর কালীশঙ্করকে সকলেই খিদীরপুরের হিন্দুসমাজের অবিসম্বাদী নেতা বলে স্বীকার করলেন। সেকালের জমিদারদের সদ্‌গুণাবলী তাঁর চরিত্রে বর্তমান ছিল। বাজার প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ জনকল্যাণকর কাজে তিনি অকৃপণ হস্তে অর্থব্যয় করতেন। প্রধানতঃ তাঁরই বদান্যতায় 'গার্ডেন রীচ' থেকে লাটপ্রাসাদ পর্যন্ত প্রশস্ত জনপথটি নির্মিত হয়েছিল। খাস সহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে এই রাস্তাটি বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল।

কালীশঙ্করের সহায়তা ও আনুকূল্যে রাজনারায়ণের পসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ফলে তিনি ১৮৩০ নাগাৎ বড় রাস্তার উপর একখানি দ্বিতল গৃহ ক্রয় করতে সক্ষম হলেন। এ বাড়ীটির একটি ঐতিহ্য ছিল যা বালক মধুসূদনের মনে হয়ত রেখাপাত করেছিল। এটি রামনারায়ণ বসু সর্বাধিকারীর বসতবাটী ছিল। তাঁর দৌহিত্র স্বনামধন্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই বাড়ীতে মাতামহের তত্ত্বাবধানে শৈশবকাল অতিবাহিত করেছিলেন। কাশীপ্রসাদ প্রথম বাঙালী যিনি ইংরাজি ভাষায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। মধুসূদন যখন এ বাড়ীতে আসেন, প্রায় সেই সময়ে কাশীপ্রসাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ; এবং তার সুখ্যাতিতে সারা

সহর তখন মুখরিত। এ অসামান্য খ্যাতি নিশ্চয় উচ্চাভিলাষী বালককে উচ্চকিত করেছিল :

শিয়রে দাঁড়ায়ে যেন কহিলা ভারতী
মৃদু হাসি,—ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?
যশের মন্দির ঐ ; ওথা যার গতি
অশক্ত আপনি যম, ছুঁইতে না পারে !

এই শক্তির সাধনা মধুসূদনের মনপ্রাণ অধিকার করেছিল,—যার উদ্‌যাপনে কোনও দিন তাঁর ক্লান্তি ছিল না, উৎসাহের কখনও অভাব ঘটেনি। আত্মসচেতন কবিমানস অতীত স্মৃতি আর ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রভাবে রসনিষিক্ত হয়ে ঘটনা ও অনুভবের ছাপ গ্রহণ করবার মত আর্দ্রতা অর্জন করে। জীবনের বিচিত্র ঘটনার সারসঙ্কলন তাঁর মানসপটে প্রতিফলিত হয়ে পরবর্তী কালে কাব্যের উপাদানে রূপান্তরিত হয়। তাই ঘটনা সামান্য হলেও কবি-জীবনে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

খিদীরপুরের বাটী কিনবার অল্পকালের মধ্যেই রাজনারায়ণ স্ত্রী-পুত্রকে সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। একান্নবর্তিতার যুগে রক্ষণশীল গ্রাম-সমাজে এ জাতীয় আচরণ বহুকাল পর্যন্ত নিন্দনীয় বলে পরিহার করা রীতি ছিল। মিতাক্ষরা সমাজের মত নিষিদ্ধ না হলেও যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কলকাতার কর্মস্থলে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বসবাস করা দায়ভাগ সমাজেও ফিরিঙ্গিয়ানা বলে ধিক্কৃত হত। এ ক্ষেত্রেও এর অন্যথা না হওয়াই সম্ভব! রাজনারায়ণ যুগ-প্রবর্তকদের মধ্যে অখ্যাত হলেও অন্যতম ছিলেন—অন্ততঃ কোনও কোনও বিষয়ে। তাই নূতন যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধে। সামাজিক আচার বা মতের তোয়াক্কা না রেখে পত্নীর প্রতি কর্তব্য পালন করবার মত সংস্কারমুক্ত সাহস

তাঁর ছিল। মনে রাখতে হবে মধুসূদনের জন্মের পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে জাহ্নবী দেবী উপর্যুপরি দুইটি পুত্রসন্তান হারিয়েছিলেন। এই নিদারুণ শোকে স্বামী-সান্নিধ্য প্রত্যেক নারীই কামনা করে। টাকা রোজগার করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রয়োজনের বেদীতে সংসারের অন্য কর্তব্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া রাজনারায়ণ যুগপ্রভাবে কর্তব্য বলে মনে করেন নি।

অবশ্য আরও একটা বিশেষ কারণ রাজনারায়ণের সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে সহায়তা করেছিল। এ যাবৎ সাগরদাঁড়ী থেকে কলকাতায় যাতায়াত সহজ ছিল না। ঘোরালো জল-পথেই লোকজন কালে-ভদ্রে আনাগোনা করত। এ অবস্থায় সপরিবারে যাতায়াত বিশেষ নিরাপদ ছিল না। এই জন্য সেকালের সংবাদপত্রের ইঙ্গিত অনুধাবন করলে মনে হয় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী থেকে যত সংখ্যক লোক কলকাতায় আসত, তার তুলনায় পূর্বাঞ্চল থেকে অনেক কম আসত। কিন্তু ১৮৩০ সালে যশোর-খুলনার লোকদের পক্ষে এ অসুবিধা অনেকাংশে দূর হল। এই সময়ে যশোরের সুবিখ্যাত দানবীর কালীপ্রসাদ পোদ্দার নিজ খরচায় যশোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত 'গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক'-এর অনুরূপ একটা প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। সেকালের সংবাদ-পত্রের ভাষায়, "এতদ্বিষয়ে অনেকের চিত্তোল্লাস হইয়াছে যেহেতু তৎপথবাসিরা অতিক্লেশে গমনাগমন করিতেন। এক্ষণে যাতায়াত সুগম হইল।" এই সুগমতার সুযোগ রাজনারায়ণ গ্রহণ করতে বিলম্ব করেননি।

অবশ্য সবচেয়ে জরুরী তাগিদ্ এসেছিল পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থাপনার আশু প্রয়োজনে। পুত্রও সাধারণ নয়। গ্রামের গুরুমশায় থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা ইতিমধ্যে তাঁর মেধা ও ব্যুৎপত্তি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। 'আলেফ-বে' ছেড়ে এখন হালফ্যাশানের 'আলফাবেট' তাঁকে শিখতে হবে। সে সময়ে সারা যশোরে এই

নব্যশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা একমাত্র টাকীতে ছিল। সেখানে কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর আশ্রয়ে একটি নব্যতন্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল যার খ্যাতি কলকাতার মনীষীবৃন্দ সানন্দে স্বীকার করতেন। কিন্তু রাজনারায়ণের পক্ষে কলকাতা টাকী থেকে দূর হলেও দুর্গম নয়। উপরন্তু কলকাতা তাঁর কর্মক্ষেত্র, এখানে তাঁর নিজের বাড়ী আছে।

তা ছাড়া রাজনারায়ণ নিজে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি সংস্কারে রক্ষণশীল হলেও, সংস্কৃতিতে নব্য-মন্ত্রে অদীক্ষিত নয় এবং সেই দীক্ষাই তাঁর সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তির কারণ। তিনি তখন সদর আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলদের অন্যতম। নয়া-বাংলার নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর সহকর্মী। এঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; এঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মৌলিক চিন্তার কোনও অভাব ছিল না। রমাপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের পুত্র; স্বর্গত পিতার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলেও, সব রকম প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। যখন ইংরাজির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য বাংলাভাষা চর্চার প্রয়োজনে 'সর্বতত্ত্ব-দীপিকা সভা' প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি সর্বানুমোদনে তার সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা করলেন, "বাংলা ভাষায় ভিন্ন এ সভায় কোনও কথোপকথন হইবে না।" প্রগতিবাদী 'রিফরমার' নেতৃবর্গের সহিত তাঁর প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। 'সংবাদ চন্দ্রিকা'-য় 'কস্যচিৎসত্যবাদিনঃ' তাঁর সম্বন্ধে অনুযোগ করে লিখেছিলেন, "উক্ত বাবু হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দুক।... তিনি দেবদেবীর পূজাকে ছেলেখেলা বলে মনে করেন।... 'সতী'বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন, ঐ দরখাস্তে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বহস্তে সহি করিয়াছেন ইহা কি 'চন্দ্রিকা' প্রকাশক জ্ঞাত নহেন?" কার্যব্যপদেশে

রাজনারায়ণ এই সব সাংঘাতিক লোকদের সহিত প্রত্যহ মেলামেশা করতেন। এঁদের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর নিশ্চয় পরিচয় ছিল, যদিও স্পষ্ট যোগাযোগ বা সমর্থন ছিল বলে মনে হয় না,— কারণ তাঁর ভাগ্যতরীর নঙ্গর ভূকৈলাসের রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে বাঁধা। তা হলেও স্বার্থ বিপন্ন না করে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, তা যেতে তিনি ভয় পেতেন না। নিজে মানসমুক্ত না হলেও, মুক্ত মানসের আবেদনে সাড়া দেবার মত সজীবতা তাঁর ছিল। প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক; তাঁর পুত্র জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঐ কলেজের ছাত্র। তাই হিন্দু কলেজ খিদীরপুর থেকে বহুদূরে অবস্থিত হলেও পাশ্চাত্য বিদ্যার পীঠস্থানে পুত্রকে প্রেরণ করবার সঙ্কল্প রাজনারায়ণের পক্ষে স্বাভাবিক।

মধুসূদন আনুমানিক ১৮৩২ সালে কলকাতায় মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বৎসর। এই অল্পবয়সে প্রতিদিন শিক্ষার জন্য খিদীরপুর থেকে পটলডাঙ্গায় পাঠানো সম্ভব হলেও সহজ ছিল না, সমীচীনও ছিল না। গ্রাম থেকে পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য এসেছিল বটে, কিন্তু সে কলকাতায় নবাগত; সহরের হালচালের সঙ্গে পরিচিত নয়। তখনও 'প্যাক্স্ ব্রিট্যানিকা' সহরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। পথে-ঘাটে রাহাজানির সম্ভাবনায় লোকে শঙ্কিত থাকত। ১৮৩৬ সালের 'চন্দ্রিকা'য় পড়ি: "এই সময়ে টাকা লইয়া দিবসে যাওয়া কি ভয়ানক হইয়াছে।...কতশত লোকের স্থানে রাস্তায় টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।...গোরা বা ইহুদী বা আরবাদি খালাসী মূর্খ লোক কি কি দৌরাত্ম্য না করে।" শেষোক্তরা গড়ের মাঠে অবাধে বিচরণ করত এবং নিরীহ পথিককে আক্রমণ করতে ভয় বা ইতস্ততঃ করত না। এইসব বিবেচনা করে রাজনারায়ণ আপাততঃ পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থা নিকটের কোনও স্কুলে করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন।

কিন্তু সে রকম স্কুল কোথায়? তখন খিদীরপুরে মিশনারীদের

একটি স্কুল ছিল বটে, এবং তাতে ইংরাজি শেখাবার ব্যবস্থাও যে না-ছিল তা নয়। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিম্নশ্রেণীর সমাজভুক্ত। এদের সঙ্গে পুত্রের মেলামেশা রাজনারায়ণের মত মানী লোক কখনই কল্পনা করতে পারতেন না। তা ছাড়া তিনি হয়ত মনে করলেন, যদি ইংরাজি শিখতেই হয়, ইংরাজের স্কুলেই তার গোড়াপত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে-যুগে এ সিদ্ধান্ত তাঁর সাহসিকতার প্রমাণ।

যোগেন বসু বলেছেন যে, হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার আগে মধুসূদন খিদীরপুরের নিকটস্থ একটি ইংরাজি স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন। হরিহর শেঠের মতে এই স্কুলটির নাম ছিল 'গ্রামার স্কুল'। এই স্কুলের সম্বন্ধে কোনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি। যতটুকু আপাততঃ উদ্ধার করা গিয়েছে তা থেকে এর শ্রেণী ও মর্যাদা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। ১৮২৩ সালে স্থানীয় ফিরিঙ্গি অভিভাবকবৃন্দ 'পেরেণ্ট্যাল য়্যাকাডেমি' নামে একটি উচ্চমানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরিক গোলোযোগের ফলে এর অবস্থা এই সময়ে খুবই বিপন্ন হয়েছিল। বেগম সমরু ও মেটকাফ এর দুর্দিনে সহায়তা করেছিলেন কিন্তু রক্ষা করতে পারেন নি। [পরে ডাভ্টন সাহেবের রাজকীয় দানে এর সংস্কার সম্ভব হয়েছিল—ডাভ্টন্ স্কুল নামে]। কয়েকজন অভিভাবক স্কুলের এই অবস্থায় বিরক্ত হয়ে 'গ্রামার স্কুল' নামে আর একটি অনুরূপ বিদ্যালয় লোয়ার সারকুলার রোড অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে ইংরাজি, ল্যাটিন, গ্রীক্, গ্রীস-রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। রাজনারায়ণের পক্ষে এই স্কুলে মধুসূদনকে ভর্তি করা স্বাভাবিক। কারণ, আদালতে যাতায়াতের পথে তিনি পুত্রকে এখানে পৌঁছে দিতে পারতেন, নিয়ে আসতে পারতেন। মধুসূদনের ইংরাজি বিদ্যার সূচনা এখানেই হয়েছিল এবং ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ও এখানেই হয়েছিল।

ইংরাজিতে একটা রসিকতা আছে—"যে পিতা আপন পুত্রকে চেনেন তিনি জ্ঞানী বটে।" এর কুটিল ইঙ্গিতটি বাদ দিয়ে এই উক্তি সরলার্থে রাজনারায়ণ সম্পর্কে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হয়। পুত্রের মানসিক বিশোষণ শক্তি সম্বন্ধে যদি রাজনারায়ণের বিন্দুমাত্র ধারণা থাকত, এই অপরিণত বয়সে তাঁর জন্য বিদেশী বিদ্যালয় নির্বাচন তিনি নিশ্চয় করতেন না। মধুসূদনের মত অতিমাত্রায় মর্মসচেতন মন পরিবেশ দ্বারা সহজেই আবিষ্ট ও বিবর্তিত হয়। এই রূপান্তর মৌলিক এবং মনের অবচেতন স্তরকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। স্মরণ রাখা কর্তব্য মনের এই স্তর থেকেই সর্বপ্রকার মৌলিক সৃজন-শীলতার উদ্ভব হয়। এই কারণেই অল্প বয়সে ইংরাজ বালক-বালিকার সঙ্গে মেলামেশার ফলে মধুসূদনের মনের গভীরতম চেতনার মৌলিক রূপান্তর ঘটেছিল। পড়ার ঘরে, খেলার মাঠে বিদেশীদের চালচলনের স্বাতন্ত্র্য তাঁর জাবনে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। সবার উপর ইংরাজি ভাষা তাঁর মাতৃভাষার সামিল হয়েছিল। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৭ সালে মধুসূদনের নাম হিন্দু কলেজের দলিলে আবিষ্কার করে পশ্চাৎ দিকে শ্রেণী-সাপেক্ষ গণনার সাহায্যে সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু যে কেহ তাঁর ছাত্রাবস্থায় লিখিত চিঠিপত্রের ইংরাজি ভাষা অনুধাবন করবেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ইংরাজি কথ্যভাষার উপর এ জাতীয় অধিকার ইংরাজি-ভাষীদের সহিত অতি অল্পবয়স থেকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলেই সম্ভব। এ পুঁথিগত বিদ্যা নয়; এ ধরণের পারদর্শিতা অধ্যাপকদের বিদগ্ধ আলোচনা থেকে আহরণ করা যায় না।

১৮৩২।৩৩ থেকে ১৮৩৭—এই চার-পাঁচ বৎসর গ্রামার স্কুলে অবস্থানের ফলে মধুসূদনের যে মানসিক সংস্কার হয়েছিল, তার বৈপ্লবিক প্রকৃতি বোঝা যায় মধুসূদনের সামাজিক চেতনার অনন্যতার দিকে দৃক্পাত করলে। একটা অভিনব সমাজের অভাবনীয় চাল-

চলন পল্লীগ্রাম থেকে সদ্য আগত এই বালককে নিশ্চয় বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। এ যেন একটা ভিন্ন জগতে প্রবেশ। এ সমাজে পুরুষের আচরণ নিঃসঙ্কোচ ও বলিষ্ঠ; মেয়েরা অপরিচিতের সামনে ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়ায় না; স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই হাস্যে-লাস্যে প্রাণতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। মধুসূদনের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকে বিজাতীয় সভ্যতার মোহে আবিষ্ট হয়েছিলেন। কেহ বা ব্র্যাণ্ডি-বীফ-এর গুণকীর্তন করেছেন, কেহ বা সাম্য-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। অনেকে অন্তঃপুরিকাদের উচ্চ-শিক্ষা দেবার স্বপ্নও দেখেছেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজের আচার-শাসিত জীবনের প্রতি গভীর বিরাগ মধুসূদনের ন্যায় তীব্রভাবে আর কেহ অনুভব করেন নি। একদিন বাল্যকালে যেমন পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য, পল্লীজীবনের মাধুর্য তাঁর মানসিক অববাহিকার পলিমাটিকে উর্বর করেছিল এবং তার প্রভাবে পরবর্তী কালে তাঁর কাব্য এক অপূর্ব দেশাত্মচেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল, এখন কৈশোরে তেমনি এক বিজাতীয় সমাজের আচার-ব্যবহার তাঁর আজন্ম-সংস্কারের ফাঁকে ফাঁকে বিস্ফোরণের মাল-মশলা সঞ্চার করেছিল, যার পরিণতি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি চমকপ্রদ।

মনোজগতের এ রহস্য রাজনারায়ণের জানবার কথা নয়। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ব্যবহারিক উপকারিতা তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং সে যুগের সকলেই একে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করতেন। এমন কি অত্যন্ত প্রাচীন-পন্থীদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল না। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পর্যন্ত এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন, যেহেতু "বৃদ্ধ মাতা ও বৃদ্ধ পিতা, সাধ্বী-ভার্যা ও শিশু-সন্তান এই সকলকে শত-সহস্র অপকর্ম স্বীকার করিয়াও ভরণ করিবেক।" এ নির্দেশ মনুরও বটে, মানবিকও বটে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ-ভাষা শিক্ষাকেই 'অপকর্ম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরও প্রাঞ্জল ভাষায় ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"অর্থকরি বিদ্যোপার্জনের আবশ্যকতা আছে, তাহা শাস্ত্রসিদ্ধও বটে; এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হবেন তখন তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকার্য হয়? ইহাতে আমি কোনও দোষ দেখি না।" কলকাতায় এসে রাজনারায়ণ দেখলেন এ ভাষার শাণিত তরবারি আস্ফালন করে কি ভাবে রামমোহন রায় বিদেশী মিশনারীদের হিন্দুধর্মের স্বর্গদ্বারের প্রবেশপথে বাধা দিয়েছিলেন; কি ভাবে সে-দিনের ছেলে রামগোপাল ঘোষ এই ভাষার তোপধ্বনিতে ফৌজদারী বালাখানা মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিত করেছিলেন। এমন কি এই ভাষায় পারদর্শিতার জন্যই স্বয়ং মেকলে তাঁকে তারিফ করেছেন,—সে গৌরব ত ভোলবার নয়! অতএব দৈত্যের বিদ্যা যদি পুত্রকে শিখতেই হয়, শুক্রাচার্যের স্মরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত,—এইটুকুই সরল বুদ্ধিতে রাজনারায়ণ বুঝেছিলেন। অন্তরাল থেকে যদি মায়াবিনী দৈত্যকন্যার মোহ মনের অগোচরে হাতছানি দিয়ে থাকে, সেটা তাঁর হিসাবের ভুল হতে পারে, সঙ্কল্পের দোষ বলা যায় না।

অবশ্য এ গেল একদিকের কথা; সম্পূর্ণ মানুষটিকে এর দ্বারা বোঝা অবশ্যই যায় না। বিজাতীয় সংস্কৃতি স্বদেশীয় সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারে, আচ্ছন্ন করে না। তাই গৃহপরিবেশের সূক্ষ্ম প্রভাবও মধুসূদনের চরিত্র গঠনে অনুপেক্ষণীয় নয়। অন্দরমহলে জননী জাহ্নবী মাতৃহৃদয়ের মধুর আকর্ষণে পরকে আপনার কাছে টেনে নিতেন; প্রতিবেশীর পুত্রকন্যারা যাঁকে মা বলে ডাকতেন, তাঁর নিজের একমাত্র পুত্র যে তাঁর অনাবিল স্নেহ-ধারায় অবগাহন করে ধন্য হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? এই সময়ে কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় হয়। বন্ধুরা আসতেন জাহ্নবীদেবীর স্নেহের আকর্ষণে; বাঁধা পড়তেন মধুসূদনের অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধনে। পরকে আপন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা মনে হয় মধুসূদন তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সারা জীবনে তাঁর বন্ধুসৌভাগ্য ছিল অসামান্য। সর্বপ্রকার অশুভ অবস্থার

মধ্যে তিনি বন্ধুদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা থেকে কখনও বঞ্চিত হন-নি। তাই মধুসূদনের অশান্ত জীবনে তাঁর মায়ের স্মৃতি ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হত: পরোক্ষভাবে তাঁর কাব্যে মাতৃস্তুতি মাঝে মাঝে উৎসারিত হয়েছে। বাঙালী মেয়েদের প্রতি বাল্যকাল থেকে মধুসূদনের অবজ্ঞার অন্ত ছিল না; কিন্তু বাঙালী মায়ের পদাম্বুজে তিনি আজীবন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

সেকালে বাইরের বৈঠকখানা ছিল বাড়ীর কর্তার নিজস্ব এলাকা। সারাদিন বৈষয়িক ও সাংসারিক কাজকর্মের ঝামেলা মিটে গেলে, সন্ধ্যা-বেলায় তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মজলিশে বসতেন। কখনও নাচ-গানের মাইফেলে আবহাওয়া খুসীতে ঝলমল করত; কখনও আলাপ-আলোচনায় আসর সরগরম হয়ে উঠত। সেকালে আধুনিক কেতাদুরস্তদের অবসর বিনোদনের এই ছিল প্রধান উপায়। এর উন্নত সংস্করণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীকে একটা বিশেষ বৈদগ্ধ্যের মর্যাদা দিয়েছিল, যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে অনুভব করেছিলেন। এ মজলিশে বালকদিগের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু অন্তরাল থেকে এর আবহাওয়া মধুসূদনের উৎকর্ণ চিত্তকে নিশ্চয় স্পর্শ করত।

বৈঠকখানার এই মজলিশকে প্রাণবন্ত করত গান-বাজনার মহড়া। একদিক দিয়ে সে যুগকে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালা কিম্বা কবি-ওয়ালাদের আখরাই গানের উপভোক্তার দল ইংরাজি নবীশদের মধ্যে ততটা ছিল না যতটা ছিল প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে। কিন্তু তার স্থান অধিকার করেছিল টপ্পা ও ঠুংরী গানের সঙ্গে তাল রেখে বাইজীদের নুপুর-নিক্কণ, অথবা নানা প্রকার মার্গ-সঙ্গীতের উত্তুঙ্গ আবেদন। অনেক কিছুর মতন রুচির এই সংস্কার রামমোহন রায় সূচনা করেছিলেন: কলকাতায় হিন্দু ও ঐস্লামিক কৃষ্টির সমন্বয়-সাধনে তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক। তাঁর মৃত্যুর পরে ঠাকুরবাড়ীর পোষকতা

ও প্রেরণায় এই রীতি তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে প্রসার লাভ করেছিল। এই সব গানের শব্দানুপ্রাস ও সুরবাহার সেকালের লোককে পরিতৃপ্ত করত। রাজনারায়ণের বৈঠকখানার গানের আসরে বালক মধুসূদনের প্রবেশাধিকার না থাকলেও এর ছন্দিত ধ্বনির রেশ তাঁর ধ্বনি-সচেতন পুত্রের মনে নিশ্চয় অনুরণিত হত, যার পরিচয় তাঁর কাব্যের প্রতি ছত্রে প্রতিধ্বনিত। মধুসূদন নিজে সুগায়ক ছিলেন। বস্তুতঃ সঙ্গীতশিক্ষা সেকালের সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। তাই অন্য অনেকের মত মধুসূদনও সঙ্গীত চর্চা করতেন। তাঁর কণ্ঠে সখীসংবাদ শুনে অন্দরমহলের মেয়েরা মুগ্ধ হতেন; আবার বাইরে বন্ধুবান্ধবেরা গজল গীত শুনে বিমোহিত হতেন। এই সুর-ঝঙ্কার মধুসূদনের কাব্যে সুর-সম্ভারে পরিণত হয়েছিল। মোট কথা খিদীরপুরের গৃহপরিবেশ মধুসূদনের মনকে মজলিশী করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মধুসূদন স্বভাবকবি এ তাঁর আসল পরিচয় নয়; তিনি একটি বিদগ্ধ সমাজের সুসংস্কৃত কবি, যাঁর মানস-বিবর্তনে নানা ধরণের প্রভাব অলক্ষ্যে ও নিঃশব্দে কাজ করেছিল। কবি-জীবনে এইজন্য এই সব তুচ্ছ ঘটনা অকিঞ্চিৎকর নয় এবং এর যথোচিত মূল্যায়নের উপর তাঁর কাব্যের মূল্য একান্তভাবে নির্ভরশীল।

অতএব আমরা দেখছি পুত্রের সর্বাঙ্গীণ মানসিক উন্নতির জন্য রাজনারায়ণ দত্ত সাধ্যমত চেষ্টা ও ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন বিলাস-ব্যসনে তেমনি মনের খোরাক সরবরাহে পুত্রের কোনও প্রয়োজন মেটাতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেন নি। অবশ্য তাঁর নিজের জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন না হওয়াতে তাঁর সাংসারিক উদ্দেশ্য আখেরে সাফল্য লাভ করে নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দু কলেজ

হিন্দু কলেজ বাংলা দেশে, সম্ভবতঃ সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদি জননী। এর কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস অনেকে বর্ণনা করেছেন; এখানে তার উল্লেখ মাত্র প্রয়োজন। মধুসূদনের ভর্তি হবার ঠিক বিশ বৎসর পূর্বে, অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর, এবং সম্পূর্ণ দেশের লোকের অর্থানুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। এতে কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর অকুণ্ঠ সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের নীতিগত সমর্থন ছিল না। প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল বিরাট, যদিও প্রাথমিক অবস্থার আয়োজন ছিল যৎসামান্য। হিন্দু সমাজের সংস্কৃতি বজায় রেখে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা এর বিঘোষিত আদর্শ ছিল। পাছে এ আদর্শ ব্যর্থ হয় ও নিষ্ঠাবান দেশবাসীর মনে সংশয় জাগে এই ভয়ে প্রতিষ্ঠাতাগণ স্বয়ং রামমোহনের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও সঙ্কল্পে তাঁর আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা কারও অপেক্ষা কম ছিল না। সরকার কোনও সাহায্য করেন নি কারণ তখনও ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উপকারিতা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। সম্ভবতঃ পাছে ইংরাজি ভাষার সুরঙ্গ দিয়ে পশ্চিমদেশের মুক্তিমন্ত্র এ দেশের তরুণদের মনে সঞ্চারিত হয় এই প্রকার একটা আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই সেদিনের ইংরাজ এই নীতি অবলম্বন করেছিল; এবং শাসন-কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ইংরাজ 'সিভিলিয়ান'দের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া অধিকতর নিরাপদ বলে বিবেচনা করেছিল, যে জন্য 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ কেরী সাহেব কি ভাবে রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি মনীষীর সহযোগিতায় বাংলা গদ্য ও ব্যাকরণের

সূচনা করেছিলেন, তা আমাদের ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু এ দেশের কূপমণ্ডুকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা চর্চার জন্য সরকারী তহবিল থেকে টোল ও মকতবে সামান্য হলেও কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হত। রামমোহন রায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, এবং তার পরিবর্তে দেশবাসীকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা দাবী করলেন। কিন্তু সরকার তাঁর আর্জি-আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন এই অজুহাতে যে, তিনি 'হিন্দুদের মুখপাত্র হবার সম্পূর্ণ অনধিকারী'। অবশ্য হেয়ার, হাইড, উইলসন প্রভৃতি কয়েকজন নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী ইংরাজের সমর্থন তিনি আকর্ষণ করেছিলেন, যার ফলে বর্তমানে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও পরে সরকারী নীতি-পরিবর্তনের পথ অনেকটা বাধামুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য এই নীতির আংশিক পরিবর্তন হল। হিন্দু কলেজের সমস্ত তহবিল জে. ব্যারেটের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। এ দেশে শিল্প প্রসারণের প্রথম অবস্থায় ফটকাবাজের প্রাদুর্ভাবে যে কয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে জে. ব্যারেটের ব্যাঙ্ক অন্যতম। এ সময়ে ডক্টর উইলসন সরকারের শিক্ষা ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ইনি প্রকৃত ভারত-বন্ধু এবং এঁর সুপারিশক্রমে এই সঙ্কটে সরকার বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। এই সময়ে গোলদিঘীর উত্তরে সংস্কৃত কলেজের নূতন গৃহের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। তার সংলগ্ন ডেভিড হেয়ারের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে সরকার হিন্দু কলেজের জন্য অনুরূপ এক গৃহ-নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নিয়মিত সাহায্য দানেও প্রতিশ্রুত হলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গৃহ-নির্মাণ সম্পূর্ণ হল এবং মে মাসে কলেজটি নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হল।

সব দিক দিয়ে নূতন বাড়ীটি 'ভাগ্যবান'দের সন্তানের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছিল। সেকালের এক সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ "এ কলেজের ঘর সকল যে প্রকার সুখদ হইয়াছে ও বালকদিগের জলপানের জন্য, বসিবার স্থান ও তাহাদিগের পরিচর্যার নিমিত্ত যে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কে না ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ প্রায় সকলেই ইচ্ছা করিবেন যে ঐ পাঠশালায় আপন আপন বালক পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করান। আর যে প্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অনুভব হইতেছে যে, অল্পকালের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেন।" বাস্তবিক পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের যাবতীয় বিষয়গুলি শিক্ষা ও অনুশীলন করবার যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই নূতন ব্যবস্থা চালু করবার অব্যবহিত পরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮২৬ সালে উনিশ বৎসরের যুবক ডিরোজিও-র শিক্ষক হিসাবে হিন্দু কলেজে যোগদান। এই যুবক স্বীয় প্রতিভাবলে শিক্ষার রীতিতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত রীতি অনুসৃত হলে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা কার্যকরী ঐতিহ্য সৃষ্টি হত। হয়নি, তার কারণ আমাদের অপরিণত ও অত্যন্ত হ্রস্ব-দৃষ্টি নেতৃত্ব। এ যাবৎ ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করাই কলেজে পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হত। ইংরাজের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে হলে ইংরাজি জানা প্রয়োজন—প্রধানতঃ এই সরল যুক্তি মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে নব্যশিক্ষার প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন করেছিল। পাড়ায় পাড়ায় সাহেবেরা স্কুল খুলে বসলেন এই সাধারণ আগ্রহের সুযোগ নিয়ে। গৌরমোহন আঢ্যের মত হিন্দু শিক্ষাবিদ্‌গণও নিজেদের বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষক নিয়োগ করলেন। এই সব বিদেশী শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই মাতলামী বা অন্য কোনও কারণে সৈন্যবাহিনী থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। সামান্য জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যৎসামান্য বেতনে শিক্ষকতার বৃত্তি অবলম্বন

করলেন। এঁদের মধ্যে পামার ও রিচার্ডসনের মত দু-চার জন শিক্ষক বিদ্বান ও নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এঁরা ভাষা শেখাতেন তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর নজর রেখে। ভাষা যে ভাবের বাহন এ ধারণা এঁদের মনে বলবৎ ছিল না। কিন্তু ডিরোজিও পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারে অক্লেশে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি হিসাবেই ইংরাজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেও প্রকৃত ভারতীয় ছিলেন; দেশের যথার্থ উন্নতির জন্যই তিনি শিক্ষকতা করতেন। তিনি বুঝেছিলেন *শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তিকে প্রসারিত* করা ও চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পথ অবারিত হয়, এবং মানুষের মুক্ত মন নির্জীব ও অনিষ্টকারী প্রাচীন রীতি-নীতি ত্যাগ করে উন্নততর নূতন পন্থা অবলম্বন করবার মনের সাহসিকতা অর্জন করতে পারে। তিনিই প্রকৃত শিক্ষক যিনি ছাত্রদের মনে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সর্বপ্রকার যুক্তিবিরোধী সংস্কারের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়সাধন করতে চেষ্টা করেন। ডিরোজিও-র অধ্যাপনা এই দিক দিয়ে সার্থক হয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের সত্যবাদিত্বের খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁরা বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করতে ভয় পেতেন না। আর এই সব ছাত্রেরা কালে প্রত্যেক জন নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একটি দিকপাল হয়েছিলেন, একথা আমরা সকলেই জানি। রামগোপাল ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক—বিদ্যায়, যশে, মানে, ব্যক্তিত্বে এঁদের সমতুল্য মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করবার কৃতিত্ব জগতে কয়জন শিক্ষক দাবী করতে পারেন?

কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে ব্যবধানের এ জাতীয় বিলুপ্তি রক্ষণশীল নেতাদের মনঃপূত হয়নি। বিচারের ভিত্তিতে আচারের ব্যবস্থা

করলে চিরাচরিত সংস্কারকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরা চেয়েছিলেন ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমার মধ্যে ইংরাজী ভাষা চর্চা। হিন্দু কলেজে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের মুখপাত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "কোম্পানি বাহাদুরের এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে বালকসকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনা দ্বারা মনুষ্যতাভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল। নানা বিদ্যা দ্বারা রাজকার্য ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম করিয়া ধন উপার্জনকরণপূর্বক ধর্মকর্ম করত সুখে কালযাপন করিতে পারিবে ভরসা ছিল। ভাগ্যহেতু ধন উপার্জন দূরে গিয়া অধর্মে প্রবৃত্ত ও নাস্তিক হইয়া উঠিল।...কোম্পানি তাহাতে মনোযোগ করেন না; বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে। অতএব হিন্দুদের ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি।"

এই আক্ষেপের মূল ডিরোজিওর শিক্ষণপ্রণালী। তিনি শুধু ক্লাসে ব্যাখ্যা ও বক্তৃতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন না; কলেজের বাইরে নানা সভা-সমিতিতে আলোচনা ও বিতর্ক দ্বারা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছাত্রদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে ও নিজস্ব মত গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতেন। এর ফলে ক্রমশঃ মত অনুযায়ী পথ আবিষ্কার ও অনুসরণ করবার স্পৃহা তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিল। কিন্তু সে-যুগে একে চরিতার্থ করবার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, রাজনীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে তাঁদের অধিকার ছিল না। ফলে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনও সহজ কর্মপন্থা রইল না। কিন্তু এ-শিক্ষা একান্ত নেতিমূলক। শুধু অস্বীকৃতির উপর কোনও সংস্কৃতি সৃষ্টি করা যায় না। অবশ্য এই অনির্দিষ্ট মনোভাবের সুযোগ খৃষ্টানেরা গ্রহণ করতে বিলম্ব করেনি। এই সময়ে হিন্দু কলেজের সরাসরি উত্তরে ডাফ্ সাহেব বাস করতেন। তিনি নিজের বাড়ীতে কতকগুলি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন করেন। শেষ বক্তৃতা

দেন টমাস ডিয়্যালটি। এই সব বক্তৃতা-সভায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের অনেকের মনে নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ দেখা দিল। মহেশ ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ঐ পথে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু ছলে-বলে-কৌশলে এরূপ 'গর্হিত' আচরণ থেকে কোনও মতে এঁদের নিরস্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

এইরূপ পরিণতির জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষেরা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু এর অবাঞ্ছনীয়তা উপলব্ধি করে প্রতিকারের উদ্দেশে একটি আদেশপত্র জারি করতে বিলম্ব করেননি। তাঁরা ঘোষণা করলেন, 'কলেজের কোনও ছাত্র ব্যক্তি যদি কোনও ধর্ম-সংক্রান্ত বা রাজ-সংক্রান্ত কোনও সভাতে গমন করে, তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইব'; এবং তাঁরা যে এই ধরণের কার্যকলাপ রহিত করতে বদ্ধপরিকর, একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন। 'ধর্ম-সংক্রান্ত'র সহিত 'রাজ-সংক্রান্ত' শব্দটির সংযোজনা লক্ষ্যণীয়। যাঁরা ধর্মবিরোধী তাঁরাই যে রাজসরকারের সমালোচনায় সব চেয়ে মুখর, এটা ইংরাজ প্রভুদের জানিয়ে দিলেন —যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, যাঁর দলকে 'চক্রবর্তীর ফ্যাক্‌শান' বলে রিচার্ডসন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। তাঁরা জানতেন ছাত্রদের এই প্রকারের দুর্মতিতে ইংরাজ কর্তাদের পরোক্ষ অনুমোদন আছে, কারণ ডক্টর উইলসন ঠিক এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত এই ধরণের আচরণের কার্যকারণ সম্পর্কের অনিবার্যতা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন এই বিজ্ঞপ্তিতে: "বালকেরা যে সকল পুস্তক পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি মানিবে না। ইহাতে যাহার ইচ্ছা হয় কলেজে বালক পাঠাইবেন, অনিচ্ছা হয় পাঠাইবেন না।" এরই পরে হিন্দু কর্তৃপক্ষেরা ইঙ্গিতে সরকারকে জানিয়ে দিলেন, চিন্তায় এ জাতীয় স্বাধীনতা শুধু যে হিন্দুধর্মকে বিপন্ন করবে তা নয়; আখেরে এর ফলে বিদেশী সরকারও বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

সম্ভবতঃ উইলসনের স্পষ্টবাদিতার ফলে অনেক অভিভাবক কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। একটি সংবাদপত্রে পড়ি, "৪৫০ কিংবা ৪৬০ জন বালক ঐ কলেজে পাঠার্থে আসিত। এক্ষণে প্রায় ২০০ বালক কলেজ ত্যাগ করিয়াছে।...জনরব হইয়াছে শ্রীযুক্তবাবু গোপীনাথ দেব, শ্রীযুক্তবাবু হরিমোহন ঠাকুর,...প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কলেজ যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।" এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে কলেজের আথিক এবং পরমাথিক অধোগতি রোধ করবার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষেরা উইলসন ও হেয়ারের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে—সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে নাটের গুরু ডিরোজিও-কে শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত করলেন।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন আছে অথচ সামাজিক জীবনে এ থেকে ঘোরতর বিপত্তির আশঙ্কা, এই উভয় সংকটের মধ্যে যখন দেশবাসীর চিত্ত দোদুল্যমান, ঠিক সেই সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মেকলের সুপারিশানুসারে স্বর্গত রামমোহন রায়ের অভীপ্সিত নীতির সপক্ষে একটি সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মেকলে লিখেছিলেন, "এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের বিধি দ্বারা আবদ্ধ নই। আমরা আমাদের রাজস্ব ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারি। আবশ্যকীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশে অর্থবরাদ্দ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সংস্কৃত বা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। দেশবাসিগণ ইংরাজি শিক্ষার জন্য সমুৎসুক। ধর্মীয় অথবা ব্যবহারিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত বা আরবী ভাষা চর্চার কোনও সার্থকতা নেই। এ দেশের লোককে ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত করা সম্ভব। এবং এই উদ্দেশ্যকে আমাদের চেষ্টা দ্বারা সার্থক করা কর্তব্য।" মেকলের এই মত গ্রহণ করে বেণ্টিঙ্ক আদেশ জারী করলেন, এখন থেকে ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরকারের তহবিল থেকে

নিয়মিত ব্যয়বরাদ্দ করা হবে, এবং সেই অনুপাতে প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করা হবে।

বিদেশী ভাষা শেখবার প্রয়োজন দুই প্রকারের: জ্ঞানার্জন ও জীবিকার্জন। জ্ঞানার্জনের সার্থকতা একমাত্র ব্যবহারিক জীবনে তার যথোচিত সদ্ব্যবহারে প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম-জীবন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। যে শিক্ষা কর্মজীবনে প্রযুক্ত ও যথোচিতভাবে ব্যবহৃত না হয়, তা অচিরে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। আধুনিক যুগে এই ব্যবহার শিল্প প্রসারণ হলেই সম্ভব হত। তাই সে যুগের নেতারা দেশের উৎপাদন ব্যবহার দ্রুত শিল্পীকরণ কামনা করেছিলেন। তাঁদের এই চেষ্টা সফল হলে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথোচিত প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহারের সুযোগ-সৃষ্টি হত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে এ-জাতীয় শিল্পবিস্তারের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এইজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হল: মাত্র সমাজ-সংস্কারেব সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রইল। কিন্তু সমাজ-সংস্কার শুধু যুক্তির সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় না। তার জন্য চাই বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ্। এই তাগিদ আসে যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তনের ফলে জীবনের গতি ও প্রকৃতি ক্রমশঃ জটিল ও সুপ্রসারিত হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই যে নিষ্ফল হয়েছিল তার একমাত্র কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়াতে আমাদের অর্থনীতি পূর্বের মত কৃষি-নির্ভরশীল থেকে গেল। কৃষি-নির্ভরশীল সমাজের সম্প্রসারণী শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এইভাবে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না হওয়াতে পাশ্চাত্য বিদ্যার আবশ্যকতা জন-সাধারণের নিকট শুধু জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করল। এ সম্বন্ধে সমসাময়িক জনৈক লেখক বলেছেন: "কেহ এমত না বুঝেন যে কেবল লাভের নিমিত্তই বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়, এমত আমাদের অভিপ্রায়। তথাপি আমরা

সুজ্ঞাত আছি যে, অধিকাংশ ছাত্র ধনহীন, এবং পরিজনদের ভরণ-পোষণাদির নির্ভর কেবল তাহাদের উপরই আছে। অতএব ঐ বালকদের বিদ্যার দ্বারা জীবনোপায়ের ভরসাতেই পিত্রাদি ব্যক্তিরা কলেজে বিদ্যালাভার্থে অর্পণ করিয়াছেন।.....আমরা কহিতে পারি যে, গবর্ণমেন্টের যদি সরকারী দপ্তরে ইংরাজি দ্বারা কার্যনির্বাহ করার মানস না থাকে, তবে যথাসাধ্য এতদ্দেশীয় লোকদিগের ইংরাজি ভাষা শিক্ষার্থে যে প্রবোধ দিতেছেন তাহা অনুচিত।...আমাদের কেবল আর এক প্রস্তাবোপযুক্ত স্থান আছে, সে এই : যে পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট এমত বিজ্ঞাপন না করিবেন সে পর্যন্ত ইংরাজি পাঠশালা স্থাপনার্থে যত উদ্যোগই হোক না কেন সকলই বিফল হইবে।" অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনে নয়, জীবিকার প্রয়োজনেই ইংরাজি শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, স্বাধীন চিন্তা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র এইভাবে সীমিত হবার ফলে সে যুগের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের মধ্যে যাঁরা অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক ও অভি-যানোন্মুখ ছিলেন, তাঁরা অন্যদিকে প্রতিহত হয়ে ধর্মসংস্কার ও ধর্মান্তর গ্রহণের দিকে মন দিলেন এবং তাঁদের মৌলিক মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের জন্য এইদিকে স্বাধীন ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। ধর্ম একান্ত নিজস্ব ব্যাপার : সেখানে ব্যক্তি স্বাধীন। তাই সামাজিক নিগ্রহের ফলে একাকীত্ব তাঁদের কাছে গৌরবময় হয়ে ওঠে। মধুসূদনের ধর্মত্যাগ সমসাময়িক অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অনিবার্য কারণ। এইজন্য তাঁর মনে কোনও দুঃখ ছিল না, কোনও অনুশোচনা জাগেনি।

আর একদিক এঁদের জন্য অবারিত ছিল,—সে হল সাহিত্যক্ষেত্র। যাঁদের কৃষ্ণ বাঁড়ুয্যে, মধুসূদন দত্ত বা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অত্যুগ্র ব্যক্তিত্ব ছিল না, তাঁরা এই দিকে সক্রিয় হলেন। এঁদের সংখ্যা বেশী, মনীষা কিছু কম নয়। এঁদের

মধ্যে যাঁরা বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাঁরা ডিরোজিও'র শিষ্য; কনিষ্ঠরা রিচার্ডসন-এর ছাত্র। এই দুই দলের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য লক্ষ্যণীয়।

ডিরোজিও শেলী-কীটস-এর সমসাময়িক। যে বৈপ্লবিক ভাবধারা রোমান্টিক কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তার বৈদ্যুতিক শক্তি তিনি হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এ বিদ্রোহ ফুটে উঠেছিল তাঁদের ধর্ম বৈরিতায়; হিন্দু কলেজের এই সব ছাত্রদের মনে নাস্তিক্যের প্রভাব এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সুদূর আমেরিকায় মুদ্রিত টম্যাস পেন-এর (সে যুগে) বহু নিন্দিত "মানুষের অধিকার" বইটির একটি সস্তা সংস্করণে কলকাতার বাজার ছেয়ে গিয়েছিল: কলেজের ছাত্রেরা এই বই গোগ্রাসে গিলত বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ডিরোজিও-র আর একটি দিক ছিল, যেটা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ডিরোজিও তাঁদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ফলে পরবর্তী কালে তাঁর ছাত্রেরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জাতীয় ভাষায় রূপান্তরিত করবার নানা আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভাষার সৌখিন বা চমকপ্রদ ব্যবহার অপেক্ষা তার কার্যকারিতার প্রতি তাঁরা বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, অর্থাৎ ইংরেজি শিখে দেশবাসীর কাছে পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচার করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের মুখপাত্র "জ্ঞানান্বেষণ" এই উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিল। এই কারণে রাধানাথ সিকদার বলতে পেরেছিলেন, "যে ভাষা মেয়েরা কি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, আমি তাকে ভাষা বলি না।" তাঁর বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র এই কারণে সংস্কৃতবহুল দুর্বোধ্য গদ্যরীতি ত্যাগ করে, কথ্য ভাষা প্রচলন করতে চেষ্টা করেন। আর একজন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ববিদ্যাসংগ্রহের বিরাট পরিকল্পনায় নিযুক্ত হলেন। সর্বত্র একই চেষ্টা: বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার। এঁদের মতে সায় দিয়ে উইলিয়াম আডাম তাঁর 'রিপোর্ট'এ(১৮৩৬) লিখলেন, "যাঁরা মনে করেন (যদি এমন কেহ থাকেন)

যে এ দেশীয় লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ইংরাজি ভাষাকে প্রধান বা একমাত্র মাধ্যম করতে হবে, তাঁদের এই মতের অবাস্তবতা সম্বন্ধে আমার যে দৃঢ় বিশ্বাস তাকে প্রকাশ না করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" কিন্তু ডিরোজিওর ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় উদ্যম অঙ্কুরে বিনষ্ট হল, কারণ কি ইংরাজ কি বাঙালী উভয়ই—অবশ্য ভিন্ন কারণে—এ দেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের বিস্তার কামনা করেনি। আগেই বলেছি তার জন্য অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হয়নি।

ডিরোজিওর পরে এলেন রিচার্ডসন: দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক অপেক্ষা সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে ইংরাজি ভাষার দাবী প্রথম স্বীকৃতি লাভ করল। হিউম্, লক্, টম্ পেন্-এর স্থান অধিকার করলেন ভাবপ্রবণ রোমান্টিক কবিরা। ডিরোজিও-রামমোহনের অভীপ্সিত লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল; কিন্তু মানসিক প্রবণতার এই লক্ষ্যবিচ্যুতির ফলে অভিভাবকদের মনে ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রশমিত হল, এবং কলেজের পূর্বেকার জনপ্রিয়তা পুনরায় স্থাপিত হল। সমাজচিন্তায় সাহসিকতার বদলে আমরা দেখি এক গতানুগতিকাশ্রয়ী মনোভাবের আবির্ভাব। গ্রামার স্কুলে অবস্থানকালে পুত্রের চাল-চলনে উৎকণ্ঠিত রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের এই আবহাওয়ায় নিশ্চয় আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সাল নাগাদ ডিরোজিও-র খ্যাতিমান ছাত্রেরা সমাজে নানা বিষয়ে নেতৃত্ব করছেন বটে, কিন্তু রিচার্ডসনের হিন্দু কলেজে এই "চক্রবর্তীর দল" পাত্তা পেত না। মেকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পালিশ করা তকমা এঁটে রিচার্ডসন ছাত্রদের কর্মজগৎ থেকে সরিয়ে ভাবজগতে নিয়ে এলেন। পূর্বে ছাত্রেরা ডিরোজিওকে অনুসরণ করত; আজ তারা রিচার্ডসনকে অনুকরণ করেই সন্তুষ্ট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দু কলেজে মধুসূদন

মধুসূদন ১৮৩৭ সালে স্কুল বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে একটি তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, ১৮৩৪ সালের টাউন হলে পারিতোষিক বিতরণী সভায় মধুসূদন দত্ত নামে একজন ছাত্র শেকস্পীয়র-এর ষষ্ঠ হেন্‌রী থেকে কিয়দংশ আর একটি ছাত্রের সঙ্গে আবৃত্তি ও অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এ বালক আমাদের কবি কখনই নয় কারণ গ্রাম থেকে সদ্য আগত দশ বছরের বালকের পক্ষে এ জাতীয় কৃতিত্ব অকল্পনীয়; তার প্রতিভা যতই চমকপ্রদ হোক না কেন। বস্তুতঃ এ সময়ে আমাদের মধুসূদন গ্রামার স্কুলের ছাত্র।

হিন্দু কলেজে মধুসূদনের মননশীলতার প্রকৃত স্ফুরণ হয়। এখানে সহপাঠী হিসাবে পেলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষা-সম্পন্ন ছাত্রদের। এঁদের মধ্যে ভোলানাথ চন্দ্র তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তথাপি দু'জনের মধ্যে শীঘ্রই গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল। ভোলানাথ নিজের ইংরাজি সম্বন্ধে যথেষ্ট অহঙ্কারের ভাব পোষণ করতেন। কিন্তু সে ইংরাজি বাঙালীর ইংরাজি,—তার বাগাড়ম্বরে যথেষ্ট খাদ ছিল। কিন্তু মধুসূদনের ইংরাজি অন্য ধরণের; এ যেন খাস ইংরাজের টাঁকশালায় মুদ্রিত, 'রাজ'কীয় গুণে সমুজ্জ্বল। নূতন ছাত্রটির এই কৃতিত্বই ভোলানাথকে সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। মধুসূদনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র ঈর্ষা ছিল না। একদিন মধুসূদনের একটি ইংরেজি সনেট 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এ প্রকাশিত হল। অপরাহ্ণের অবসর কালে গোলদীঘির দিকে সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর বসে মধুসূদন ভোলানাথকে কবিতাটি পড়ে শোনালেন। মুগ্ধ ভোলানাথ তখনই রিচার্ডসনের সঙ্গে বন্ধুর পরিচয় করে দিলেন:

যেন দক্ষ কারিগরের হাতে পড়ল একতাল খাঁটি সোনা। কতটা খাদ মেশাতে হবে, কি ধরণের পালিশে ভাষার জৌলুস খুলবে, কিরূপ কারুকার্য শোভনতা বাড়াবে—এই কারিগরী বিদ্যা মধুসূদন সযত্নে শিখলেন মেজাজী গুরুর নিপুণ নির্দেশে। মধুসূদনের হিন্দু কলেজে আসা সার্থক হল। এর পর থেকে যখনই কিছু রচনা করতেন, অবসরের সময়ে রিচার্ডসন তাকে সযত্নে সংশোধন করে দিতেন এবং নানা উপদেশ দিয়ে কিশোর কবিকে উৎসাহিত করতেন।

হিন্দু কলেজে মধুসূদন পড়া-শুনায় কোনও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন বলে মনে হয় না। অন্ততঃ সে সম্বন্ধে বিশেষ নজির ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় অনুসন্ধানীও আবিষ্কার করতে পারেননি—যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে ভূদেব, ভোলানাথ, রাজনারায়ণও সম্বন্ধে। কিন্তু তাঁর আকৃতি-প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমরা করতে পারি। তাঁর শারীরিক গঠন কৃশকায় ও নাতিদীর্ঘ; তাঁর ললাট উন্নত ও প্রশস্ত; চক্ষু আয়ত ও উজ্জ্বল; অধরোষ্ঠ স্থূল; দেহকান্তি স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ। তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত মোলায়েম ও প্রীতিপূর্ণ; তাঁর আচরণ সপ্রতিভ ও সতেজ। তিনি হাস্য-পরিহাস ভালবাসতেন; তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা সকলেই উপভোগ করতেন। আলাপে-আলোচনায় তিনি আসর মাতিয়ে রাখতে পারতেন। তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং তাঁদের সাথে রঙ্গ-রসে মশগুল হয়ে থাকতেন। বৈঠকী আলাপে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি তর্ক করতেন, নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না; মতের জন্য কখনও কারও মনে আঘাত দিতেন না। ভূদেবের সঙ্গে তর্ক হত প্রচুর কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মতে মত দিয়ে তর্কের অবসান করতেন। অর্থাৎ যুক্তির চাইতে আবেগ তাঁকে পরিচালিত করত। যুক্তি শাণিত তলোয়ারের মত; তা দিয়ে আক্রমণ করা যায়, প্রতিপক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করা যায়। কিন্তু আবেগ যেন স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী; তার সার্থকতা মনের আনন্দে

ভেসে যাওয়া। রামমোহন বিদ্যাসাগরের ধারালো ঋজু মনের সঙ্গে মধুসূদনের কোন প্রকৃতিগত মিল ছিল না, বিদ্যাবত্তায় তাঁদের সমকক্ষ হয়েও। ভোলানাথ বলেছেন, "মধুর ব্যবহারে তাঁর নাম সার্থক হয়েছিল। তাঁর সমস্তটাই মধু; তার মধ্যে তিক্ত বা কষায় বিন্দুমাত্র ছিল না। চালচলনে কোন নাটুকেপনাও ছিল না; সবই অত্যন্ত ঘরোয়া, সাদাসিধা। সব সময়ে মুখে হাসি লেগে থাকত। চব্বিশ ঘণ্টা যেন একটা মধুর আবেশে আবিষ্ট। সকলেই তাঁকে পছন্দ করত; সকলের মনেই তাঁর প্রতি একটা প্রীতি ও স্নেহের ভাব বর্তমান ছিল।"

ছাত্রাবস্থায় বেশভূষা সম্বন্ধে তিনি কতকটা খেয়ালী ছিলেন বলে মনে হয়। অন্ততঃ তার রীতিতে বারবার পরিবর্তন হয়েছিল। প্রথম প্রথম অন্য পাঁচজনের মতন তিনি ধুতি-চাদর পরে কলেজে আসতেন। পরে একটা 'একছোটের দল' তৈরী করলেন—অনেকটা পরবর্তী কালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'চাদর নিবারণী সভা'র মতন। সহসা এ বেশ ত্যাগ করে আচকান-ইজার পরে কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের চমকিত করলেন। শেষের দিকে পুরাপুরি সাহেবী পোষাক ব্যবহার করতেন। বেশভূষায় বাঙালীর খেয়ালীপনার সূত্রপাত সম্ভবতঃ মধুসূদনই করেছিলেন। পাল্কীতে দু'তিন দফা পোষাক থাকত; বার বার বেশ পরিবর্তন করে দেহের নির্মলতা রক্ষা করতেন। এসেন্স জাতীয় সুগন্ধি নিজে ব্যবহার করতেন, প্রিয় বন্ধুদের বিতরণ করতেন! এ ঠিক বিলাস নয়; এ একটা পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের নমুনা। এ যেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাষ।

মধুসূদনের অপরাপর বন্ধুদের মধ্যে প্রথমেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ে। ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বৃত্তি পেয়ে তিনি হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে মধুসূদনের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের এই প্রথম পরিচয়ের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ ভূদেব দিয়েছেন। তখন-কার দিনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে ব্যঙ্গ করা ইংরাজি-

নবিশদের অভ্যাস ছিল। ভূগোল পড়াতে গিয়ে রামচন্দ্র মিত্র পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিবৃত করছিলেন ; সহসা তিনি ভূদেবকে বললেন যে, তাঁর পিতা একথা কখনই বিশ্বাস করবেন না। ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ; তিনি সংস্কৃত চর্চায় তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহায়ক ছিলেন। ভূদেব তাঁর নিকট মিত্র মহাশয়ের উক্তি যাচাই করে এবং এ বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রীয় প্রমাণ শিক্ষা করে পরদিন রামচন্দ্র মিত্রের নিকট তা নিবেদন করলেন। ভূদেব লিখছেন: "রামচন্দ্রবাবু ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয় তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কালো হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল ; দেখিলে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলে মনে হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, সে মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটির পর আমার নিকট আসিয়া শেকহ্যাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, তোমার নাম কি ? কোথায় বাড়ী তোমার ?' ইত্যাদি। তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ ও সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে প্রকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম। ইনিই মধু।" দু'জনের স্বভাব বা প্রকৃতিতে মিল নেই, তথাপি চারিত্রিক আকর্ষণে উভয়ই পরস্পরের গুণমুগ্ধ হলেন।

ভূদেবের পরে গৌরদাস বসাকের সঙ্গে আলাপ হল: ইনিই কবির আজীবন বন্ধু। পর বৎসর গৌরদাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে মধুর সতীর্থ হলেন। মধুসূদনের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এঁকে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এঁদের দুজনের মধ্যে কোনও ব্যবধান ছিল না। বিলাসদ্রব্য থেকে বই-কেতাব এক জনের যা ভাল লাগত, অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি না করা পর্যন্ত কোনও সুখ ছিল না। মধুসূদনের আর কারও প্রতি এমন অকৃত্রিম

ভালবাসা ছিল না। একদিনের অদর্শনে, নিয়মিত চিঠি না পেলে অধীর হয়ে পড়তেন।

ভোলানাথ, ভূদেব, গৌরদাস—এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন শ্যামাচরণ লাহা ও বঙ্কুবিহারী দত্ত। ছাত্রাবস্থায় এই পাঁচজনের সঙ্গে মধুসূদনের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। মতের অমিল, ব্যবহারে অমিল, তা সত্ত্বেও কি নিবিড় অনুরাগবন্ধন! মধুসূদন যখনই ভূদেবের বাড়ী যেতেন, বন্ধু-জননী পরম স্নেহভরে "গায়ে ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন; স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন।" খাদ্য যৎসামান্য—রুটি ও ঘণ্ট, কিন্তু তাই খেয়ে মধুর কি আনন্দ! এমন ঘণ্ট নাকি তিনি জীবনে কখনও আস্বাদন করেননি। এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতি মধুসূদনের মন থেকে কখনও অপসৃত হয়নি; পরবর্তী কালে তাঁর কাব্যে তিনি বার বার দেখা দিয়েছেন। কখনও কখনও গৌরদাস, ভোলানাথ, বঙ্কুবিহারীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন, সেখানে জাহ্নবী দেবী তাঁদের রাজকীয় আহার্যে পরিতুষ্ট করতেন: বন্ধুরা বলতেন, সবই ভাল কিন্তু সে পোলাওর তুলনা হয় না,—'the Czar of all dishes'। তারপর নিভৃতে বন্ধুরা মধুসূদনের সুমিষ্ট গলার গজল শুনতেন এবং বিলাতী কায়দায় পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করতেন। মধুসূদন কখনও ভূদেবকে খিদীরপুরে নিমন্ত্রণ করেননি: বোধ হয় এই কারণে যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ীর ধরণ ও রাজনারায়ণের বাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল: সুতরাং সেখানে নিয়ে গেলে পাছে বন্ধুর প্রীতি না নয়, এই সহজ শালীনতাবোধ মধুকে নিরস্ত করেছিল। হিন্দু কলেজে মধুসূদন ছিলেন কালা-পাহাড়দের দলে। কখনও কলেজের প্রাঙ্গণে ভূদেব প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে 'বিজাতীয় প্রণালীর' সপক্ষে তুমুল তর্ক করতেন, 'স্বজাতীয় প্রণালী'কে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। কখনও বা স্কুলের প্রাচীর লঙ্ঘন করে গোলদিঘীর পশ্চিমে

মুসলমানের দোকান থেকে রুটি-কাবাব কিনে হৈ-হুল্লোড় করে আহার করতেন। কিন্তু বারাঙ্গনার প্রতি মধুর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না— সে যুগে ধনীপুত্রদের মধ্যে এ ধরণের সংযম এতই অনন্যসাধারণ ছিল যে বঙ্কুবিহারী এ কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। এ জাতীয় কোনও প্রসঙ্গ উঠলে মধুসূদন কখনই তাতে যোগ দিতেন না। দেহের ও মনের শুচিতা রক্ষা করা তাঁর সারা জীবনের স্বভাব ছিল। সেই যুগ-পরিবেশের মধ্যে তাঁর এই অনন্যতা প্রতিভার খেয়াল বলে বন্ধুরা মনে করতেন।

প্রতিভাই বটে। ভূদেব পরবর্তী কালে প্রায়ই বলতেন কার্যব্যপদেশে তাঁকে বহু সহস্র ছাত্রের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভা তিনি কখনও দেখেননি। নিজে অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু মধুর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে করতেন। বঙ্কুবিহারী তাঁকে হিন্দু কলেজের তারকারাজির মধ্যে উজ্জ্বলতম বলে স্বীকার করতেন। ভোলানাথের যথেষ্ট বিদ্যাভিমান ছিল; তিনি রিচার্ডসনের প্রিয়পাত্র ছিলেন; কিন্তু তিনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদনের প্রতিভা অতুলনীয় ছিল; তাঁর মন স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ('pregnant with celestial fire')। প্যারীচাঁদ সরকার তাঁকে বাংলার 'পোপ' বলে অভিহিত করতেন, বোধ হয় এই স্মরণ করে, পোপ্-এর মত "he lisp'd in numbers for the numbers came". এঁরা কেহই পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তাঁর প্রতিভাকে যাচাই করেননি। পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মধুসূদন এঁদের কখনও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। কিশোরীচাঁদ বলেছেন, "যাঁহারা বিদ্যার্জন ঐশ্বর্য ও যশোলাভের একমাত্র উপায় উপদিষ্ট হইয়াছেন,—সেই সকল পরিশ্রমী 'বড়ে'র* নিকট বিলাসী ও আমোদপ্রিয় বালকগণ যে পরাস্ত

*হিন্দু কলেজের ধনী ছাত্রগণ হেয়ার স্কুলের বৃত্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র ছাত্রদের এই নামে অভিহিত করত। এ সংন্ধে রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' দ্রষ্টব্য।

হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি?" মধুসূদন বড়লোকের ছেলে: বিলাসীও ছিলেন, আনন্দপ্রিয়ও ছিলেন। কিন্তু এই 'বড়'দের সঙ্গেই তিনি মেলামেশা করতেন। এ সম্বন্ধে ভূদেব লিখেছেন, "মধু আমি যতবার পরীক্ষা দিয়াছি আমি তার উপরে হইয়াছি। তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদের মধ্যে অতুল বলিয়াই জানিতাম।" বস্তুত পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে মধুসূদন নিরাসক্ত ছিলেন। ১৮৪০-এর বাৎসরিক পরীক্ষায় মেডেল পেয়ে রাজনারায়ণকে অতিক্রম করেছিলেন; একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি ভূদেবকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন; 'জুনিয়ার' বিভাগের শেষ পরীক্ষায় তিনি অন্য দশ-জনের সঙ্গে বৃত্তিলাভ করেছিলেন। কলেজে এই তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি। এর মানে এ নয় যে চেষ্টা করলে তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারতেন না। কিন্তু বোধ হয় ভাবতেন কবির পক্ষে এ জাতীয় চেষ্টা অশোভন। এ প্রসঙ্গে একটা কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু কলেজে অধ্যাপক রীজ্ (Rees) অঙ্কশাস্ত্র পড়াতেন। সম্ভবতঃ তিনি বেশ জবরদস্ত প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন; ছাত্রদের গাফিলতি ক্ষমা করতেন না। তাঁর ক্লাসে রাজনারায়ণ, বঙ্কু প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতেন; অনেক সময়ে ভয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করতেন। মধুসূদনের অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি কোনও আসক্তি ছিল না; কিন্তু পলায়ন করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। একদিন ক্লাসে একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে কোনও ছাত্রই পারেনি। সহসা সকলকে বিস্মিত করে মধুসূদন বোর্ডে গিয়ে অঙ্কটি কষে দিলেন। এবং স্বস্থানে বসবার সময়ে পার্শ্বস্থিত বন্ধুদের বিজয়গর্বে বললেন, "দেখলে ত, ইচ্ছা করলে শেক্সপীয়র নিউটন অনায়াসে হতে পারে।" যা আপাতদৃষ্টিতে নাটকীয়তা বলে মনে হয়, আসলে তার পশ্চাতে বহুদিনের অধ্যবসায় ছিল। বন্ধুরা তর্ক করেছিলেন, শেক্সপীয়রের পক্ষে নিউটন হওয়া অসম্ভব। এই উক্তিকে অপ্রমাণ করবার জন্য তিনি সকলের অগোচরে গণিত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য নিউটন যিনিই

হোন না কেন, তিনিই যে আগামীকালের শেক্সপীয়র সে সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোনও সংশয় ছিল না।

তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের তুলনা নেই। ছাত্রাবস্থা থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। বন্ধুদের বলতেন, "আমার খ্যাতি একদিন জগৎকে স্তম্ভিত করে দেবে।" বলতেন, "আমি একদিন মহাকবি হব; তোমরা আমার জীবনচরিত রচনা করবে।" অন্য কেহ এ জাতীয় অহঙ্কার করলে দাম্ভিকতা মনে হত; কিন্তু মধুসূদনের মুখে এ ধরণের উক্তিকে কেহই অশোভন মনে করেননি। কিন্তু করেননি কেন? তার কারণ, মাত্র ১৬।১৭ বৎসরের একজন যুবক, অথচ এরই মধ্যে "জ্ঞানান্বেষণ", "লিটারারী গ্লীনার," "স্পেকটেটর" প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা তাঁর কবিতা সাদরে গ্রহণ করত। প্রতিদিন একটা নতুন কিছু রচনা করে বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দিতেন: কোনোটা হাল্কা রসের কাব্যকণিকা, কতকটা গ্রীক্ 'এপিগ্রাম'-এর ষ্টাইলে, কৌতুকে সমুজ্জ্বল; কোনোটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা, কল্পনার রঙে আর রোমান্টিকতার রসে পরিপ্লুত; কোনোটা বা কোনো কাহিনীর ছন্দায়ুলেখ,—হয়ত বায়রণ ও স্কটের অনুকরণ মাত্র, কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষীয় বিদেশী যুবকের পক্ষে এ কৃতিত্ব সামান্য নয়।

আর নিজের উপর কি বিশ্বাস! "আমি আচারের চিরশত্রু।... আমি জগৎকে এক নতুন কিছু শেখাব! রাগ করো না। এই দেখ আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'সনেট' রচনা করেছি (ইংরাজিতে)। কি অভিনব এ প্রচেষ্টা।" এ লিখছেন ১৭।১৮ বৎসরের একজন বালক।

ইংরাজি সাহিত্যে এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুর্লভ বলে সনেটটি পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধার করে দিলাম:

Now many a bird—not *Kokils*—Philomels—
But of diviner kinds—began to sing
So sweet a dirge above the bier of day,
As might have made, ye, Sons of this poor Earth
Sigh for a death that is so fondly mourned.
Now from the west rose six moons hand in hand
Like a soft band of beauties—blushing—fair—
Oh! how their beams did brighten all the scene,
The light fell on lakes and murmuring rivers
Like silver mouths: Here the Sonnet endeth.

রূপ-কল্প ও ভাষা প্রয়োগ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী, কিন্তু বিস্ময়কর একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় বাঙালী যুবকের প্রচেষ্টা হিসাবে।

যে কাব্যরচনা মধুসূদনের জীবনের একমাত্র সাধনা, এইভাবে তার সূত্রপাত হয়। এই একটি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের জন্য তাঁর অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে তাঁর মন ডুবে থাকত। চিঠিপত্রে এমন অবলীলাক্রমে শেক্সপীয়রের ভাষা জুড়ে দিতেন, যেন এইসব বচন তাঁর কলমের ডগায় লেগে থাকত। মিল্টনের কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল এই অল্প বয়সে। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "মধুসূদন একদিন ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় গিয়েছিলেন, আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি মিল্টন হইতে এত কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, আমি, ইংরাজি কবিতা মুখস্থকারী হইয়াও আশ্চর্য হইয়া গেলাম ও তাঁহার নিকট পরাভব মানিলাম।" মিল্টনকে অনুকরণ করবার স্পৃহা ছাত্র-জীবনেই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। রিচার্ডসনের ছাত্রেরা রোমান্টিক কাব্যরসে অভিষিক্ত ছিল। তাই মধুসূদনের এই সময়ের রচনায় কীটস-এর কবিতার প্রতিধ্বনি যে-কোনোও সহৃদয় পাঠক অনুভব করবেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি যে সময়ে ইংলণ্ডেও সাধারণের মধ্যে বিরল, সেই সময়ে বাংলাদেশের এই যুবক স্বরচিত কতকগুলি কবিতাগুচ্ছ তাঁকে আবেগভরে উৎসর্গ করছেন! বিলাতের 'বেন্টলির ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদককে নিজের পরিচয় দিতে

গিয়ে কাউলির একটা বচন উদ্ধার করে নিজেকে "বিদ্যায় শিশু কিন্তু বয়সে নয়" বলে বর্ণনা করছেন। কাব্যরচনায় তাঁর স্বাভাবিক শক্তি নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল একনিষ্ঠ সাধনা, অক্লান্ত অধ্যবসায়, অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়। তাঁর চিঠিপত্র পড়লে তাঁর পড়াশুনার বহর সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। বাড়ীতে সর্বক্ষণ পুস্তকের জগতে বাস করতেন। কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে তিনি এমন কারও সহিত মিশতেন না যার সঙ্গে এ-জাতীয় মনের মিল থাকা সম্ভব নয়।

মধুসূদন ছিলেন যাকে বলে "আলালের ঘরের দুলাল"। কিন্তু তিনি কখনও আরামের প্রলোভনে কর্তব্যে অবহেলা করেননি; কষ্টবিমুখও ছিলেন না। আত্মীয়-বন্ধুদের রোগশয্যায় তিনি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন, রোগীর কষ্ট-যন্ত্রণায় বেদনাবোধ করেছেন, নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে। "আমার এক কলেজের সহপাঠী মৃত্যুশয্যায়; গত চারদিন আমার এক তিল ঘুম হয়নি"—এ ধরণের চিঠি থেকে তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক দেখতে পাই। তাঁর বন্ধুপ্রীতির তুলনা হয় না।

মধুসূদন ছাত্রাবস্থায় বেহিসাবী হয়ত ছিলেন কিন্তু বদখেয়ালী ছিলেন না। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা বঙ্কুবিহারী বিশেষ করে করেছেন। গৌরদাসের কোনোও আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করে একবার মধুসূদন লিখেছিলেন, "আমার ভয় হয় কলকাতার যুবসমাজে যেসব দুর্নীতি দেখা যায় তুমি তার বশীভূত হচ্ছ।" অপর পক্ষে তাঁর চরিত্রে সহৃদয়তার অভাব ছিল না। লেখাপড়ায় বন্ধুদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কোনোও দরিদ্র বন্ধুর অর্থাভাব ঘটলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার অভাব নিরসন করতেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভূদেবের পিতা কলেজের বেতন নিয়মিত না দিতে পারায়, তাঁর পড়া বন্ধ হবার উপক্রম হল। একথা শুনে মধু বিশেষ দুঃখিত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হবে? আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই। আমার টাকা থেকে স্কুলের বেতন অনায়াসে দিতে পারব।" এ দাতব্যের

মধ্যে কোনোও অহঙ্কার বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব ছিল না। এই পরদুঃখে সমবেদনা বোধহয় তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তি। অপর পক্ষে ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা বা অনুরূপ কোনোও সঙ্কীর্ণচিত্ততা তাঁর চরিত্রে আদৌ ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁর ইংরাজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেখে ও প্রশংসা শুনে ঈর্ষানুভব করত; প্রতিযোগিতায় তারা অংশ গ্রহণ করতে সাহসী হত না। কিন্তু মধু সকলের প্রতি মধুবর্ষী ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় মধুসূদনের দুইটি দোষ বিশেষ করে দেখা দিয়েছিল। প্রথমতঃ, বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তিনি এক উন্নাসিক তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন। তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথমে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ একজন বাঙালী এ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন, হোন না তিনি স্বয়ং রামগোপাল ঘোষ। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অবজ্ঞার সীমা ছিল না: "এ ভাষা ভুলে যাওয়াই ভাল"—এ তাঁর মুখের বুলি ছিল। বাঙালী মেয়েদের প্রতি তিনি বিদ্রূপাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, নিজের জননী বা ভূদেব-জননীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অবধি ছিল না, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি বিজাতীয় ভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার স্বাধীন সংস্কারমুক্ত মনোভাবের জন্য তিনি গর্ব অনুভব করতেন। একদিন রাজনারায়ণ হুঁকার নল পুত্রের হাতে দেওয়াতে গৌরদাস বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন; তাঁকে মধুসূদন গর্বভরে বলেছিলেন, "আমার বাবা তোমাদের ঐসব সাবেকী রীতি গ্রাহ্যও করেন না।" পিতা দেশজ সংস্কার বর্জন করেছিলেন বলে মধুসূদনের এই অহঙ্কার। বেশভূষায়ও তিনি ক্রমশঃ ধুতি চাদর ত্যাগ করে বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করতেন। সাগরদাঁড়ি এখন অনেক পিছনে পড়ে আছে; তাঁর মন এখন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে সুদূরে পাড়ি দিয়েছে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় দোষ তাঁর অনুকরণপ্রিয়তা। কি আচরণে, কি চিন্তনে তাঁর চরিত্রে মৌলিকতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সাহেবদের বেশভূষা, ইংরাজ কবিদের রচনারীতি, এমন কি রিচার্ডসনের

হাতের লেখা পর্যন্ত তিনি অনুকরণ করতেন। একদিন অধ্যাপক জোন্স্ তাঁকে শেষোক্ত কাজে ব্যাপৃত দেখে হেসে বলেছিলেন, "মধু, তুমি কি মনে করো ক্যাপ্টেনের হাতের লেখা নকল করলে তুমি তাঁর মতন কবি হবে?" মধু লজ্জিত হলেন, কিন্তু তাঁর মোহভঙ্গ হল না। যে দুইটি কবিতা বাংলায় তিনি এই সময়ে রচনা করেছিলেন, তাও সমসাময়িক আদিরস নিষিক্ত প্রকৃতি বর্ণনার অক্ষম অনুকরণ মাত্র। ভূদেব ঠিকই বলেছিলেন, "মধুর বুদ্ধি বিশদ মণির মতন ছিল; প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।" মৌলিকতা বা দৃঢ় চিন্তাশক্তির অভাব তাঁর মননশীলতায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

* * * *

১৮৪১ সালে হিন্দু কলেজে মধুসূদনের শান্তিপর্বের অবসান হল। তাঁর জীবনে এই আলোয় ভরা আবহাওয়ার মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে দূরে আকাশে ঘনঘটা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে এল। ক্রমশঃ এক দুর্যোগের ঝটিকা তাঁর মনোজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে স্নেহের সম্পর্ক, কর্তব্যের বাঁধন, যা কিছু জীবনে শান্তি নিয়ে আসে, সব ছিন্নভিন্ন করে তাঁকে অনির্দেশের পথে লক্ষ্যহারা করল। যে ঝড়-ঝঞ্ঝাট (storm and stress) একদিন গ্যেটে কিম্বা ওয়ার্ডসোয়ার্থের জীবনে বিপর্যয় এনেছিল, আমাদের কাব্যসাহিত্যে একমাত্র মধুসূদনের জীবনে তার পুনরাবৃত্তি রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা প্রমাণ করে।

এ সময়ে তিনি যদি মাতৃভাষায় কবিতা লিখতেন, তাঁর মানসিক অবস্থার পরিচয় হয়ত পাওয়া যেত। কিন্তু বিদেশী ভাষায় অন্তরের সূক্ষ্ম মনোভাব প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ সে ভাষা নৈর্ব্যক্তিক: তাতে মরমের স্পর্শ নেই। তবু দু' একটা কবিতায় যেন একটা অশান্তির সুর ধরা পড়ে: যেমন—

> I wander'd forth alone, I know not where;
> For it was in that maddened mood of mind
> When, like the impetuous tide that rusheth blind
> Beckoned by the pale Queen of Night from far
> A thousand feelings rush from out their springs
> And deluge the sad heart.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কঃ পন্থাঃ

১৮৪২ সালে মধুসূদন হিন্দু কলেজের 'সিনিয়র' অর্থাৎ কলেজ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। অষ্টাদশ বৎসরের যুবক—কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের অনির্দিষ্ট ইসারায় দেহ-মন উচ্চকিত। এই বয়স সম্বন্ধে আত্মপ্রেক্ষণায় অসামান্য ধীসম্পন্ন জন্ কীট্‌স্ লিখেছিলেন: "কিশোরের কল্পনা সুস্থ, প্রৌঢ়ের পরিপক্ব কল্পনাও সুস্থ। কিন্তু এর মধ্যে একটা সময় আছে যখন মন বিক্ষুব্ধ, চরিত্র অনিরূপিত, লক্ষ্য অনবধারিত, আশা-আকাঙ্ক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন। এই অবস্থা থেকেই অসুস্থ ভাবালুতার উদ্ভব হয়।" রবীন্দ্রনাথও এই অবস্থার বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন, "তখন বয়স আঠারো; বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখানে সত্যের আলো স্পষ্ট হবার সুবিধা নেই। একটু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু খানিকটা খানিকটা ছায়া।" অর্থাৎ এই বয়সে একটা অস্পষ্ট অনুভূতির আবেগে মন দিশেহারা। ইংরাজ কাব্যসাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য, ইংরাজের সামাজিক জীবনের কঠোর বাস্তবতা কীট্‌স্-এর ভাবালুতাকে সত্যকার উপলব্ধির মাঝে সংহত হবার সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর গাঢ় ইন্দ্রিয়ানুভূতি গভীর সত্যানুভবে রূপান্তরিত হয়ে তাঁকে একটা স্থির লক্ষ্যের সন্ধান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনাকে মহর্ষির আধ্যাত্মিক প্রভাব ও ভারতের ধ্যান-কেন্দ্রিক সাধনা আত্মোপলব্ধির মাঝে সমাহিত করেছিল; যার ফলে একটা ব্যক্তি-চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বমানবের বেদনা অনুভব করার পথ তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল। স্থির লক্ষ্য কাজের প্রেরণায় সংহতি আনে, আর কাব্য প্রকাশে আনে বাস্তবতা। কিন্তু মধুসূদনের মানসচর্যায় এ জাতীয় ব্যক্তিগত বা ঐতিহ্যগত প্রভাবের অভাব ছিল।

প্রতিকূল আবহাওয়ার আবর্তনে পড়ে তাঁর অত্যন্ত মর্মসচেতন মন অনির্দেশের আকর্ষণে কেন্দ্রচ্যুত,—ফলে তাঁর জীবনে সংকটের সম্ভাবনা দিন দিন ঘনীভূত হয়ে এল। এই মানসিক চঞ্চলতার ইসারা তাঁর এই সময়ের চিঠিপত্রে ও কবিতায় ছড়িয়ে আছে। এর মূল কথা সর্বপ্রকার শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও অসদ্ভাব; ঘরে বাইরে কোথাও স্থিরতা নেই; আত্মীয়-বন্ধুর উপর নির্ভরতা নেই; মনের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু কোনও স্থির লক্ষ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনে এই ধরণের চিত্তবিকলতা পরিদৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু মহর্ষির মাধ্যাকর্ষণ তাঁকে কেন্দ্রবিক্ষেপ থেকে রক্ষা করেছিল। তাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে অটল হয়ে রইলেন। মধুসূদন এ ধরণের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

১৮৪১ থেকে ১৮৪২ : কালের ব্যবধান মাত্র এক বৎসর; হয়ত কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু মানসিক পরিবর্তনের হিসাবে এই স্বল্প সময়টি মধুসূদনের জীবনে যুগান্তকারী। এই পরিবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত ধরা পড়ে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচিত্রণের একটি সামান্য বর্ণনায়। রাজনারায়ণ ১৮৪২ সালে হেয়ারের বিদ্যালয় থেকে হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগে মধুসূদনের সমশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। তখনও উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়নি; তাই নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ করবার মতন দৃষ্টি তাঁর ছিল। তিনি লিখছেন: "মধু যখন কলেজে পড়তেন তখন তিনি অতি নিভৃত স্বভাব ছিলেন। দু'একটি বন্ধু ছাড়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। আমার সহিত বাক্যালাপ ছিল না। প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এইরূপই হইয়া থাকেন।" এই স্বল্পভাষী আত্মনিবিষ্ট নিভৃত স্বভাবের মধু কিন্তু এ যাবৎ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন, অন্ততঃ ভোলানাথ-ভূদেব-গৌরদাস-বন্ধু প্রমুখ বন্ধুদের বর্ণনায় এঁর সন্ধান নেই। এর কারণ আছে। আমাদের মনের গভীর স্তরের পরিবর্তন অতি ধীরে এবং সকলের, এমন কি নিজেরও, অগোচরে সম্পন্ন হয়। বাইরে দেখা

যায় সামান্য চাঞ্চল্য ও উৎক্ষেপ, যাকে মধুসূদনের বেলায় তাঁর বন্ধুরা প্রতিভার খেয়াল বলে মনে করতেন, কারণ তাঁদের কাছে তাঁর জীবনধারার প্রকাশ্য অভিব্যঞ্জনায় কোনও পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায় নি ; তাঁদের মনে হত হাস্য-পরিহাসে, আলাপে-আলোচনায়, পঠনে-পাঠনে তিনি ঠিক পূর্বের মতই মশ্‌গুল হয়ে আছেন। তাঁর বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমাও অব্যাহত আছে ; কখনও ইউট্রোপিয়াস, কখনও শেক্সপীয়র বা বায়রণের জন্য মন পিপাসিত। আনন্দেরও অভাব নেই ; বজরায় নৌবিহারে অংশগ্রহণের জন্য বন্ধুদের আমন্ত্রণ করছেন ; 'যাত্রা' দেখছেন, 'তামাসা' উপভোগ করছেন ; রিচার্ডসন তাঁকে অভিনয় দেখবার জন্য 'পাস' দিয়েছেন, গৌরদাসের জন্য 'পাস' যোগাড় হয়নি, তবুও তাঁকে প্রবেশদ্বারে উপস্থিত থাকতে অনুনয় করছেন—সাহেবের সঙ্গে খাতির আছে, হয় ত, শেষ মুহূর্তে আর একখানা জোগাড় হতেও পারে। প্রাকৃতিক শোভাদর্শনের প্রতি আকর্ষণ কমে গেছে বটে, কিন্তু বন্ধুর আকর্ষণ আগের মতই আছে। আপাতদৃষ্টিতে জীবনধারায় কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়নি ; তা হলেও একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস আসন্ন ও অনিবার্য। খুঁটিনাটি নিয়ে অসন্তোষ বেড়ে উঠছে অপরের আচরণের বিরুদ্ধে, কারণে-অকারণে ; চিঠিপত্র প্রায়ই প্রতিবাদে কণ্টকিত। সারা দুনিয়া যেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে : তা না হলে তাঁর মতন কবিকেও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়, কের্ সায়েবের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়! আক্ষেপ করে বন্ধুকে লিখছেন, "হায় রে কাল! হায় রে রীতি!"

পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু বৃত্তি পেলেন না। কলেজের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের সীমানা ছাড়িয়ে এখন অন্য চিন্তা, অন্য সাধনায় মন নিবিষ্ট। অথচ ক্ষমতার কোন অভাব নেই। রামগোপাল ঘোষ 'স্ত্রীশিক্ষা'-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় একটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য পদক দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। মধুসূদন প্রথমে এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ

করতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু ভূদেবের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি অবশেষে যোগ দিলেন এবং ভূদেবকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক লাভ করলেন। এ কম কৃতিত্ব নয়। কিন্তু মন আর কলেজে নেই। একটার পর একটা ঘটনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময়ে রিচার্ডসন ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছেন; তাঁর স্থলাভিষিক্ত কের্ সাহেবের সঙ্গে আদৌ বনিবনাও নেই। "শয়তান কের্-এর আমলে কলেজে না যেতে আমি বদ্ধপরিকর।" এ বিরাগের হেতু অজানা। কের্ সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁর শাসন ছিল কঠোর। সে যাই হোক, যেমন কথা তেমনি কাজ: বাড়ী বসে বন্ধুকে অনুকম্পামিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে লিখলেন, "কি হে, পড়ুয়ার দল, তোমারা সব আছো কেমন? হিন্দু কলেজটি মর্ত্যজগতে একটি আস্ত দানবপুরী; শয়তান কের্ তার মহিমান্বিত অধিপতি।"

গৃহেও শান্তি নেই: সহসা পিতার সঙ্গে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠল। কারণ অজানা হলেও অনন্থমেয় নয়। প্রতিভাসম্পন্ন পুত্র: বিদ্যাশিক্ষা করে দেশের ও দশের মধ্যে বরণীয় হবে,—পুত্রের জীবনের এ পরিণতি কোন্ পিতা কামনা না করেন? কবি মিল্টন কেম্ব্রিজ থেকে বিতাড়িত হয়ে ঘরে বসে রইলেন; বিদ্যাশিক্ষা শেষ করবার কোনো উদ্যম নেই; অথচ তার জন্য পিতার নিকট তাঁকে কোনদিন জবাবদিহি করতে হয়নি: কিন্তু মিল্টনের মত পিতা এক ও অনন্য। কলেজের অধিকর্তার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ীতে বসে থাকা ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মত্ত থাকা রাজনারায়ণ কখনই প্রীতির চক্ষে দেখেননি। মধুসূদনের মতিগতিও তাঁর পিতামাতাকে আর নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। কথায় কথায় আজন্ম সংস্কার নিয়ে হাসাহাসি; বাঙালী মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। এমন কথাও কানে আসে পুত্র নাকি খিদীরপুরের সমবয়সী খৃষ্টানদের সঙ্গেও মেলামেশা করেন। সম্প্রতি নবীন মিত্র নামে এক প্রতিবেশীর পুত্রকে মিশনারীরা ফুসলিয়ে খৃষ্টান করেছে; শোনা গিয়েছে মধু তার

কাছে যাতায়াতও করে। ঈশ্বর গুপ্তের মতে মিশনারীগুলো ত 'কেঁদো বাঘ'—বিশেষ করে যেগুলো 'হেদো-বনে' বাস করে। মিশনারীদের বিরুদ্ধে হেয়ার-এর সতর্ক প্রহরা অনেক যুবককে সংযত রেখেছিল। হেয়ার মনে করতেন খৃষ্টান ধর্মের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেলে অভিভাবকেরা ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বিরূপ হবেন; এ শিক্ষার প্রসার বন্ধ হবে। কিন্তু ১৮৪২ সালের জুন মাসে হেয়ার সহসা সারা বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মধুসূদনের মত ধর্মান্তর গ্রহণে উন্মুখদের গতিবিধির উপর নজর রাখবার আর কেহ রইল না। মধুসূদন মাঝে মাঝে 'কেষ্টা' পাদরীর কাছে যাতায়াত করেন, তার আভাসও রাজনারায়ণের কানে কি আসে নি? এই সব দেখে শুনে রাজনারায়ণ দিশেহারা হয়ে ঠিক করলেন পুত্রকে সাগরদাঁড়িতে নির্বাসিত করবেন: লেখাপড়া যদি না করে অন্তত বিষয়-আশয়ের তদারক করতে শিখুক। অন্তত এতে বিপদকে হয়ত ঠেকানো যাবে

মধুসূদনের নিকট এ আদেশ যেমন অপ্রত্যাশিত, পিতামাতার অনাবিল স্নেহে এই ছেদ তেমনি অভাবনীয়। এই সংকটের সম্মুখে তাঁর বিহ্বলতা একখানি চিঠিতে পরিস্ফুট: "আমার জীবনে ঝড় নেমে এসেছে। আমার উপর অবিলম্বে সহর ছেড়ে দেশে চলে যাবার আদেশ জারি হয়েছে। হায় হায়, আমি কোথায় যাব? যদি আমার মনের কপাট খুলে দেখাবার সামর্থ্য থাকত, আমার অবস্থা তোমাকে দেখাতে পারতাম; তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমার প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে যাব—(বিশেষ করে একজনকে—ভেবে নাও সে কে)—এ চিন্তায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়—'কি অসহনীয় এ দুঃখ, কি দুর্বিষহ এ বোঝা'। আমি যদি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়। আমার সে অনুমতি নেই। প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর গৌর, প্রিয়তম বন্ধু, আমাকে ভুলো না।" কিন্তু দুঃখ যতই হোক, মধুসূদন নিজের সংকল্পে অটল। চিঠির শেষে জানাচ্ছেন পরদিন কেরু-কে

চরমপত্র দেবেন, ও বেলেঘাটা থেকে দেশের দিকে রওনা হবার পথে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার "অনুমতি নেই!" তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। ইতিমধ্যে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য রাজনারায়ণ দত্তের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কার অবধি নেই। আর কাউকে বিশ্বাস নেই—গৌরদাস বসাককেও নয়, গৌরদাস যদিও তাঁর বন্ধু ও পরম বৈষ্ণব রাজকৃষ্ণের পুত্র। মনে হয় অসহায় পিতা পুত্রের মতিচ্ছন্নতার জন্য সংসর্গদোষকেই দায়ী করছেন। এ বিষয়ে হিন্দু কলেজের 'সুনাম' ত তাঁর অবিদিত নয়; কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখবেন? তাই সিদ্ধান্ত করলেন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া চলবে না; কোনোও মতেই কলকাতার ত্রিসীমানায় থাকতে দেওয়াও চলবে না। অবশ্য এ ব্যবস্থা নেতিমূলক, হতাশের আশা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও মধুসূদন এ আদেশকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর অসন্তোষ এখনও বিদ্রোহাত্মক হয়ে উঠেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশে যেতে হয়নি। হয় রাজনারায়ণ পুত্র-সর্বস্ব জাহ্নবী দেবীর অনুনয় এড়াতে পারেন নি, না-হয় পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহপরবশ হয়ে, না-হয় পুত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়ায় শঙ্কিত হয়ে, কিম্বা তাকে খুসী করে বিবাহে রাজী করাবেন এই মনে করে—যে কারণেই হোক, নির্বাসন দণ্ড প্রত্যাহৃত হয়েছিল। ঠিক দুমাস পরে (অক্টোবর ৭, ১৮৪২) মধুসূদন গৌরকে লিখছেন, "আমি চলেছি—যশোরে নয়,—তমলুকে; বাবার এক বড়লোক বন্ধু তমলুকের রাজার বাড়ী।" কলকাতা ত্যাগে অনিচ্ছা যথেষ্ট, কিন্তু এবার তেমন আপত্তি নেই। যশোরে হত নির্বাসন; তমলুকে নূতন অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া অন্য কারণেও মন অতিমাত্রায় প্রফুল্ল: ইংলণ্ডে 'ব্ল্যাকউড্' পত্রিকায় কবিতাগুচ্ছ পাঠিয়েছেন,—উৎসর্গপত্রে লিখেছেন, "এই কবিতাগুচ্ছ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসোয়ার্থকে পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁর এক বিদেশী

গুণগ্রাহী উৎসর্গ করিল।" আশ্চর্য এই যে, যে সময়ে ইংলণ্ডে ওয়ার্ডসোয়ার্থের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ, এই তরুণ বাঙালী কবি তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত। এযে শুধু মুখের কথা নয়, বোঝা যায় তাঁর এই সময়ে রচিত কতকগুলি সনেট থেকে, যাতে ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রভাব পরিস্ফুট। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

> Yon brook that warbles low as it doth run
> Quite uncontrolled, by its own sweet will led ;
> The breezes that with innocence and glee
> Sings to yon listening groves, an audience fair.

অথবা—

> Beauteous hour!
> The boundless heav'n bathed in the bright'ning shower
> Of large sunshine, was now faitly spread
> With smiles.

অবশ্য এ যে শুধুই ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রতিধ্বনি বা অনুকরণ, তা নয়। এতে নানা কবির সুর প্রতিধ্বনিত ; কখনও শেক্স্পীয়র, কখনও মিল্টন, আবার মাঝে মাঝে মূর-এর হাল্কা ভাবালুতা প্রমাণ করে যে এ গুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রের কাব্য-অনুশীলন মাত্র।

কল্পনায় কত কি মনে হয়। আজ দেশে বসে ওয়ার্ডসোয়ার্থের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন : কে জানে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলে হয়-ত কোনোও দিন সশরীরে বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার সুযোগও আসবে। শেক্স্পীয়র্-মিল্টন-এর সমকক্ষ হতে হলে নিশ্চয় তাঁদের দেশে যেতে হবে। কিন্তু এখনও এ মাত্র মনের বাসনা ; কার্যে পরিণত করবার আগে কল্পনায় রস আস্বাদনের যে তৃপ্তি, আপাততঃ তাতেই তরুণ কবির মন উৎফুল্ল।

কিন্তু এসব আল্নাস্কারের স্বপ্ন আপাততঃ মুলতুবী রেখে পিতার সঙ্গে তমলুকেই চল্লেন। ঠিক তমলুক সহরে নয় ; সহর থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের সন্নিকটে কোনও গ্রাম। পূজার উৎসবে রাজ-বাড়ী মুখরিত। কলকাতা থেকে গণ্যমান্য অতিথিদের আদর-

আপ্যায়নের রাজোচিত আয়োজন। আমোদ-প্রমোদের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা,—নাচ-গান-যাত্রা—সবই আছে। উর্বশী না হোক, সেবাদাসী যে খুঁজলে পাওয়া না, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু এসবে কবির ভ্রুক্ষেপ নেই; মন পড়ে আছে অন্যত্র। একমাত্র আনন্দ—সমুদ্র বেশী দূরে নয়; উপকূলে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডগামী জাহাজগুলিকে দেখবার সুযোগ হয়। তাই দেখে কবির কল্পনা সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছায়। মনের উচ্ছ্বাসে বন্ধুকে না লিখে পারেন না, "আমি সেই সমুদ্রের সন্নিকটে এসেছি,—একদিন (আশা করি সেদিনের বেশী দেরী নেই) যার তরঙ্গ মথিত করে আমি ইংলণ্ডের গৌরবমণ্ডিত উপকূলে পৌঁছাব।"

ইংলণ্ডে যাবার এই বাসনা তিনি বৎসরাধিককাল মনের অন্তরালে পোষণ করছেন। একদিন কবিতায় এ আশা প্রকাশ করেছিলেন:

(1)

I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountains high,
Tho' friends, relations I have none
In that far country ; yet, oh, I sigh
To cross the vast Atlantic wave,
For glory or a nameless grave.

(2)

My father, mother, sisters all
Do love me and I love them too ;
Yet oh ! the tear-drops rush and fall
From my sad eyes, like winter's dew ;
Yet oh ! I sigh for Albion's land
As if she were my native land.

[আলবিয়ন-এর সুদূর উপকূলের তরে
আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে;
—তার সবুজ উপত্যকা; তার সু-উচ্চ গিরিরাজি।
যদিও বন্ধু, কোনও আত্মীয় আমার নেই
সে সুদূর দেশে; তবু হায়! দীর্ঘশ্বাস পড়ে
আটলান্টিকের তরঙ্গে পাড়ি দিবার তরে—
সেথা আছে গৌরব অথবা নামহীন মৃত্যু।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী সকলেই
ভালবাসে মোরে ; আমিও তাদের বাসি ভাল।
তবু অশ্রু-ধারা ঝরে
মোর আঁখি হতে শাতের শিশিরবিন্দু সম।
তবু হায় দীর্ঘশ্বাস পড়ে মোর আলবিয়ন তরে,
—জন্মভূমি যেন সে আমার!

অবশ্য তিনি নিশ্চয় জানতেন সাফল্যের পথে বাধা অনেক। তখন ইংলণ্ডে যাওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়নি। শাস্ত্রের নিষেধ, পরিজনের আপত্তি, অবস্থার প্রতিকূলতা—এ সব অতিক্রম করা সহজ নয়। রামমোহন, দ্বারিক ঠাকুরের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকের পক্ষে তা কল্পনার অতীত। এও ঠিক মধুসূদন যে সাধারণ বাঙালী যুবক নয়, এ কথা সম্ভবতঃ রাজনারায়ণ দত্ত বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন। তাই তাঁর এত উদ্বেগ, এত চক্রান্ত। কোনও রকমে পুত্রের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। তমলুকে বাঙালী জমিদারী জীবনের জাঁক-জমক দেখে হয়ত পুত্র বিমোহিত হবেন। অন্য প্রকার প্রলোভনেরও অভাব নেই। সিদ্ধার্থের পিতা অনুরূপ অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে ঐ একই পথ গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদনের মন ভোগবিমুখ নয় বটে, কিন্তু সংসারমুখীও নয়। বিবাহের প্রসঙ্গ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না। ভালো মন্দ কোনও সংস্কারের প্রতিই তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। অথচ ভোগের মধ্যেও অদ্ভুত সংযমী তাঁর মন। বঙ্কুবিহারীর সাক্ষ্য মনে পড়ে: "আমি এইটুকু বলতে পারি নীতির দিক দিয়ে তিনি অত্যন্ত সংযমী ছিলেন। খিদীরপুরের রূপজীবীনীদের সম্পর্কে তাঁর কোনও অপবাদ শোনা যায়নি। হাল্কা মেজাজে বন্ধুরা কখনও এ নিয়ে কোনও কথা উত্থাপন করলে তিনি কর্ণপাত করতেন না, এবং তাঁদের বেশীদূর অগ্রসর হতেও দিতেন না।" এই উন্নত নৈতিক শালীনতাবোধের উপর দাঁড়িয়ে একদিন তিনি বন্ধুর পদস্খলন অনুমান করে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বিত্তশালীর গৃহে এ

জাতীয় ঔদাসীন্য সে যুগে অস্বাভাবিক বলে উদ্বেগ সৃষ্টি করত। অতএব রাজনারায়ণ দত্ত যদি মনে করে থাকেন যে, পুত্রের এই সংযমের রক্ষা-কবচ না ভাঙলে তাঁকে উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধা সম্ভব নয়, তাঁকে এ যুগের বিচারে বিচার করা অনুচিত হবে। বহুদিন পর্যন্ত পুত্রের ইন্দ্রিয়াসক্তিতে ইন্ধন জোগানো জমিদার বাড়ীর রীতি ছিল। রাজনারায়ণ সম্পর্কে এ জাতীয় অনুমান মধুসূদনের একখানি চিঠির একটি কুণ্ঠিত স্বীকৃতিতে সমর্থিত বলে মনে করি: গৌরদাসকে তমলুক থেকে লিখছেন: "আমি এখানে একটি প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছি। অতএব দেখছ, আমি কঠোর ব্রহ্মচারী থেকে একেবারে লম্পটে পরিণত হয়েছি।" যে বন্ধুকে একদিন তিরস্কার করেছিলেন, পরিহাস ছলে তাঁর কাছে নিজের পদস্খলন স্বীকার করতে পেরেছেন কারণ এ সত্ত্বেও নিজের উপর আস্থা হারাননি।

কিন্তু তমলুকে তাঁর কবিত্বশক্তি যেন হঠাৎ লুপ্ত হয়েছে। মিল্টন-এর মতন হয়ত তিনি মনে করতেন, "যিনি পরবর্তীকালে সর্বজনপ্রশংসিত বিষয়ে কাব্যরচনায় ব্যর্থ না হতে ইচ্ছা করেন, তাঁর জীবন যেন সত্যই একখানি কাব্য হয়",—অর্থাৎ তেমনি সুসংযত, তেমনি ছন্দোবদ্ধ, তেমনি ভাবপ্রদীপ্ত। তমলুকের আবহাওয়ায় তাঁর জীবনে ছন্দপতন ঘটেছিল; ক্ষণেকের তরে নটীর নূপুর-নিক্কণের কাছে বাণীর বীণাগুঞ্জন যেন পরাভূত হয়েছিল। তাই দুঃখ করে বন্ধুকে লিখছেন: "জানো, সম্প্রতি আমি কোনও একটি বিষয়ে কবিতা রচনা করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু চার ঘণ্টা চেষ্টা করেও এক ছত্র লিখতে পারিনি। হয় আমার কাব্যলক্ষ্মীকে তোমার কাছে রেখে এসেছি, না হয় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।... আমার বিশ্বাস আমি যেখান থেকে তোমাকে লিখছি, অর্থাৎ তমলুক, সেখানে আসতে তিনি ঘৃণাবোধ করেন।" স্বল্প ভাষা, কিন্তু তমলুক সম্বন্ধে তার ইঙ্গিত অতিশয় সুস্পষ্ট। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে জানিয়ে দিচ্ছেন, "মনে করো না আমার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।

...কলকাতায় পৌঁছে তোমাকে কবিতায় ভাসিয়ে দেব।" এই প্রতিভা-সঞ্জাত আত্মবিশ্বাস জীবনের কোনও অবস্থায় তিনি কখনও হারাননি।

দুই সপ্তাহ প্রবাস-বাসের পর পিতার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর মতিগতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। বরং স্বপ্নজগতে কল্পনাবিলাসের বদলে হঠাৎ বাস্তব জগতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। যা ছিল আশায়, তা ভাষায় ফুটে উঠল—অবশ্য প্রসঙ্গ-ক্রমে। তাঁর সম্বন্ধে পিতামাতা যে সঙ্কল্প করছিলেন, তা নিশ্চয় তাঁর অজানা ছিল না। চক্রব্যূহের প্রবেশদ্বার বন্ধ হবার আগে নিষ্ক্রমণের পথ উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা নিশ্চয় সমীচীন, এই বুঝে তিনিও প্রস্তুত হলেন। ইংলণ্ডে যাবার বাসনা এখন সংকল্পে পরিণত হয়েছে; সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট। ২০শে নবেম্বরে বন্ধুকে লিখছেন: "যখন আমি ইংলণ্ডে যাব,—আশা আছে সে দিন আর দেরী নয়—(পরের বৎসর শীতকাল)—আমার ইচ্ছা তোমার ছবি একখানা নিয়ে যাব।" তারপর পাঁচ-দিন যেতে না যেতে এমন একটা কথা লিখলেন যা আমাদের সচকিত করে। ২৫শে নবেম্বর লিখছেন: "আমি এখন পিতামাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি। (এর বেশী বুঝিয়ে বলব না, বুঝে নাও)। ভাল কথা,—গতকাল সন্ধ্যায় তোমার এতদূর স্পর্ধা হয়েছিল যে তুমি সাহস করে বললে, তুমি আমার ইংলণ্ডে যাবার সঙ্কল্প বাবাকে বলে দেবে, যাতে আমার যাওয়া না হয়। তুমি যদি বাস্তবিক এ রকম কিছু ভেবে থাক, তুমি নিশ্চয় আমার বন্ধু নও। এ রকম মন নিয়ে তুমি রসাতলে যাও। হয়ত তুমি ভাবছ বাপ-মাকে ত্যাগ করছি বলে আমি খুব নিষ্ঠুর। হায় প্রিয় বন্ধু, আমি তা জানি, আর মর্মে মর্মে অনুভব করি। কিন্তু পোপ্ বলেছেন, 'কাব্যলক্ষ্মীর অনুসরণ করতে হলে পিতামাতাকে-ও ত্যাগ করতে হবে।' যথেষ্ট বলেছি। তুমি বুদ্ধিমান, ভেবে দেখো।" বোঝা যায় ব্যাপারটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অঙ্কুর পল্লবিত হতে সুরু হয়েছে।

ইংলণ্ড যাবার জন্য পিতামাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! যা বহুদিন যবনিকার অন্তরালে ছিল, তা সহসা দৃশ্যপটের সামনে প্রকাশিত হল। তাঁর চিঠিপত্রে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে এই সব আচমকা দু'একটা কথা থেকে বেশ বোঝা যায় ইংলণ্ডে যাবার বা খ্রীষ্টান হবার কল্পনা একটা আকস্মিক 'মস্তিষ্কের তরঙ্গ' নয়; এর পিছনে ছিল অন্ততঃ কয়েক মাসের প্রস্তুতি,—অনেক গুপ্ত জল্পনা-কল্পনা, অনেক লোকের প্রচ্ছন্ন সহায়তা। বৎসরাধিক পূর্বে কোনও এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে একটি অসমাপ্ত কবিতায় তিনি বলছেন:

Plunged in the fathomless abyss of dark despair
Friendless I drop many a silent tear;
I stretch my hands for succour all around,
But oh! for me no succour can be found!
If thou, dear Sir, do kindly deign to save,
Do then—

["তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যের অতলস্পর্শ গহ্বরে নিমজ্জিত
বন্ধুহীন আমি, নিরন্তর নীরবে অশ্রু বর্ষণ করি।
হাত বাড়াইয়া দিই সাহায্যের তরে চতুর্দিকে;
কিন্তু হায়! মোর তরে সহায়তা নাই কোনও খানে।
যদি আপনি, হে মহাশয়, দয়াপরবশে রক্ষা করেন অনুগ্রহভরে,
তাই করুন।"]

কে এই অজানা ভদ্রলোক যাঁর নিকট এ আবেদন? সম্ভবতঃ ইনি সেই ইংরাজ যাঁর সহিত কৃষ্ণমোহন মধুসূদনের পরিচয় করে দিয়েছিলেন, এবং যিনি মধুসূদনকে নিজের পক্ষপুটে স্থান দিয়েছিলেন। পিতামাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রের পরিধিতে আছেন এই সব অনেক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি; কেন্দ্রে ছিলেন স্বনামধন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধুসূদনের আত্মজীবনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট অংশ আজও অনিরূপিত। কোনও একদিন মধুসূদন তাঁর নিকট গিয়েছিলেন, এবং তার পরে ঘনঘন যাতায়াত করেছিলেন। তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাও করেছিলেন—এ কথা কৃষ্ণমোহন নিজেই

বলেছেন। যদিও এ ঘটনার সন-তারিখ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই, মধুসূদনের জীবনের storm and stress ১৮৪১ সাল থেকে সুরু হয়েছিল—তাঁর ঐ বৎসরের কবিতা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। তাঁর এই চিত্তবিকলতা ইংলণ্ডে যাবার বাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁর ঐ সময়ে রচিত দুইটি কবিতা থেকে আগেই উদ্ধার করেছি; আর একটি কবিতায় লিখছেন—

> Oh ! thus abandoned to despair
> I've naught but grief for me ;
> My life a wilderness appears,
> O'ergrown with miesry.
>
> [হায় ! এই ভাবে নৈরাশ্যের মাঝে পরিত্যক্ত হয়ে
> আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই।
> আমার জীবন যেন ঘোর অরণ্য
> যন্ত্রণায় সমাচ্ছন্ন।]

ভঙ্গীটা বায়রণীয়; এমন কি কতকটা নাটকীয় বলা যায়। কিন্তু নাটকের অন্তরালে থাকে সত্য ঘটনা—নাটক যার প্রতিফলন মাত্র। মধুসূদনের মানসিক উৎক্ষেপের কারণ তাঁর অন্তরের গভীরতম বাসনাকে পূর্ণ করবার সহজ পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। যে পথ আছে তা বাধাবিঘ্নে সমাকীর্ণ। বাস্তবের বাধায় সত্য যেখানে বিঘ্নিত বা প্রতিহত, সেখানে কল্পনা প্রতীকী কাব্য-রচনায় রূপান্তরিত হয়। তাই তিনি কবিতায় পিতামাতাকে ত্যাগ করবার কথা বলছেন; সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর চিঠিতে এরূপ আচরণ যে নিষ্ঠুর তাও স্বীকার করছেন। একে নাটুকেপনা মনে হয় তার কারণ আঠারো বৎসরের যুবকের চিত্তে যতটা আন্দোলন, হয়ত ততটা গভীরতা নেই। শেক্স্পীয়র বলেছেন:

> "একটা ভীষণ কর্তব্য সম্পাদন আর তার প্রথম
> চিন্তনের মধ্যবর্তী কাল যেন একটা কুটিল কল্পছায়া,
> একটা দুঃস্বপ্ন!
> তখন মানুষের মনোজগৎ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মত
> বিপ্লবে আন্দোলিত।"

মধুসূদনের মনেরও এই অবস্থা, এবং এই কারণেই নানা চিন্তার পর অবশেষে তিনি কৃষ্ণমোহনের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন। এ সম্পর্কে কৃষ্ণমোহনের বিবরণ অত্যন্ত জরুরী। তিনি বলছেন:

"আমি যখন কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীটে খ্রাইষ্ট চার্চ-এর ধর্মযাজক হিসাবে বসবাস করছি, মধু একদিন আমার নিকট এসে নিজেকে ধর্মজিজ্ঞাসু ও খৃষ্টধর্মগ্রহণেচ্ছু বলে পরিচয় দিল। এরপর সে আরও কয়েকবার এসেছিল এবং আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল। এর ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে তার ইংলণ্ড যাবার বাসনা খৃষ্টান হবার ইচ্ছা থেকে কিছু কম নয়। আমি এই দুইটি প্রশ্নকে এক সাথে দেখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে আমি আলোচনা করলাম বটে, কিন্তু বিলাত যাবার সম্বন্ধে কোনও সাহায্য করতে পারব না আমি জানিয়ে দিলাম। মনে হল এতে সে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হল, এবং আমার নিকট আর ঘন ঘন আসেনি। একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমার এক বন্ধু কোনও এক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীকে হিন্দুকলেজের এই ছাত্রের কথা বলেছিলাম যে, সে খৃষ্টান হতে আর বিলাত যেতে চায়। আমার বন্ধু এর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি মধুর সঙ্গে পরে দেখা হলে সেই বন্ধুর নিকট তাকে পাঠিয়ে দিলাম। ইনি মধুকে যথেষ্ট সমাদর করে সর্বপ্রকার সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং বাংলার ডেপুটি গভর্ণর মিষ্টার বার্ড-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।"

এই বিবরণে যে ঘটনাগুলি বিবৃত করা হয়েছে তা অল্প দিনের ব্যাপার কখনই নয়। কৃষ্ণমোহন স্বীকার করেছেন মধু অনেকবার তাঁর কাছে আনাগোনা করেছিলেন; তারপর যাতায়াতের বহর কমে যায় কিন্তু যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। ইতিমধ্যে একজনের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়; মধু যখন পুনরায় এলেন, তখন পরপর দুজন পদস্থ ইংরাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন—এ সব দু'এক মাসের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব বেশ ধীরে

সুস্থে চলেছিল; কারণ তাড়াহুড়া করলে জানাজানি হবার সম্ভাবনা। খুব সম্ভব কৃষ্ণমোহনের ঐ বন্ধু কিম্বা বার্ড-এর মধ্যস্থতায় কোনও সময়ে আর্চডিকন ডিয়ালট্রির সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় হয়েছিল, এবং তাঁর নিকটই খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা-নবিশী হয়েছিল বলে মনে হয়। সেকালে সফলকাম ধর্মপ্রচারক হিসাবে ডিয়ালট্রির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি কলেজের ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ রাখতেন। ডাফ্ সাহেবের সভা-সমিতিতে তিনি যোগ দিতেন। জনসমাকীর্ণ কলকাতায় কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে বেশী মেলামেশা হলে, বন্ধু মহলে অবিদিত থাকত না; কিন্তু সাহেব-পাড়ায় ডিয়ালট্রির সঙ্গে দেখা শোনা করা সকলের অগোচরেই সম্ভব ছিল। আরও এক বৎসর হয়ত এইভাবে কেটে যেত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে এমন একটি সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠল যাতে সহসা ঘটনার গতি ত্বরান্বিত হল। মধুসূদনের পক্ষে আর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকা সম্ভব নয়; একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে; একটা পথ বেছে নিতেই হবে। সে কোন্ পথ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্মত্যাগ

ঘটনাটি মধুসূদনের বিবাহ প্রস্তাব। তমলুক থেকে প্রত্যাগত হলে তাঁর পিতামাতা কোনও এক স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত জমিদারের রূপসী কন্যার সহিত তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করেন। ভেবেছিলেন সংস্কারের শান-বাঁধানো পথে চলতে শিখলে বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংবাদে মধুসূদন কতদূর বিচলিত হয়েছিলেন তা গৌরদাসকে লিখিত চিঠি থেকে জানতে পারি: "আমার দুঃখের বোঝা যে কি নিদারুণ তা তুমি জান না। আমার ইচ্ছা করে—বাস্তবিকই ইচ্ছা করে—আমাকে যদি কেউ ফাঁসি দেয় আমি বেঁচে যাই। আজ থেকে তিন মাস পরে আমায় বিবাহ করতে হবে। মর্মান্তিক চিন্তা। মনে করলে আমার রক্তে শিহরণ জাগে; আমার কেশরাজি সজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। আমার বাগ্‌দত্তা কোনও এক ধনী জমিদার-কন্যা। ভবিষ্যতের অতল গহ্বরে না-জানি তার জন্য কি ভীষণ দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তুমি আমার দেশ-ত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জান। সে সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়। সূর্য হয়-ত পূর্ব আকাশে উঠতে না পারে, কিন্তু আমার মন থেকে এ সঙ্কল্প কখনও যাবার নয়। স্থির জেনো দু'এক বৎসরের মধ্যে হয় আমি ইংলণ্ডে যাব, না হয় আমি ইহজগতে থাকব না—এ দুয়ের মধ্যে একটা হবেই। গৌর, তুমি আমার বন্ধু; আমার অন্তরের গোপন কথা তোমার কাছে প্রকাশ করছি; জানি কখনও ফাঁস করে দেবে না। তুমি সজ্জন, কিন্তু এ যাবৎ আমি তোমার কাছ থেকেও এ সব কথা গোপন রেখেছি। কিন্তু আজ পারছি না। আমি সহানুভূতি চাই। আর কার কাছে তা আমি আশা করব?" মধুসূদনের জীবনসঙ্কট তাঁর কাব্যে প্রায়ই

অপ্রকট, কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন বোধ হয় ঠিকই অনুমান করেছেন যে, পরবর্তী কালে রচিত অসমাপ্ত নাটক 'মায়া-কানন'-এ অজয়ের চরিত্রে মধুসূদন অজ্ঞাতসারে নিজের যৌবনের ছবিই এঁকেছেন: "বৃদ্ধ রাজা পুত্রের নিকট পাঞ্চাল রাজকন্যার সহিত বিবাহের কথা উল্লেখ করিলে অজয় 'একেবারে রাগান্ধ হয়ে' পিতাকে বলিল, 'পিতা! আমার অনুমতি বিনা আপনি এ কাজ কেন কল্লেন?' "

অবশ্য বিবাহ করবেন না এ সঙ্কল্প প্রথমে তাঁর মনে উদয় হয়নি। উপরের পত্রে দেখি বিবাহান্তে বধূর অবস্থা কল্পনা করে তাঁর মানবিক মমত্ব উদ্বেল হয়ে উঠেছে; 'দু এক বছর' পরে বিলাত চলে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে এই ভেবে তিনি বিচলিত। প্রশ্ন মনে জাগে সহসা তিনি বিবাহ সম্বন্ধে ও তাঁর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করলেন কেন?

ইতিমধ্যে খৃষ্টান মিশনারী ও ধর্মযাজকদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছে; সম্প্রতি তাঁদের নিকট তাঁর বিলাত যাওয়া সম্বন্ধেও এমন কিছু প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যার বলে তিনি দুই বৎসরের মধ্যে বিলাত যেতে পারবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। মিশনারীরা বেশ জানতেন যে, যদি মধুসূদনের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়, তাঁর ধর্মান্তরগ্রহণের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হবে। হয়-ত তখন মধুসূদনের নিজের মতেরও পরিবর্তন হবে; আগ্রহ কমে যাবে। খৃষ্টান মিশনগুলি বিলাত থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য পেত। মাঝে মাঝে দু'চার জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে দীক্ষিত না করলে দেশে মান থাকে না। সে যুগে নানাপ্রকার সৎ-অসৎ উপায় হিন্দু যুবকদের ধর্ম পরিবর্তনে প্ররোচিত করবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। হিন্দুরা বাধা দেবার বেলায় যেমন, খৃষ্টানেরা কাজ হাসিল করবার বেলায় ঠিক তেমনি নিঃসঙ্কোচ ছিলেন। অতএব বিবাহ প্রস্তাবের পর মধুসূদন খুব সম্ভব খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা অবিলম্বে ধর্ম ত্যাগে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। বিলাত যাবার প্রতিশ্রুতি না পেলে তিনি সম্ভবতঃ অন্য পথ অবলম্বন করতেন।

খৃষ্টধর্মে মধুসূদনের বিশ্বাস কতদূর আন্তরিক ছিল সে আলোচনা নিরর্থক। তাঁর নিকট খৃষ্টধর্ম হিন্দু সমাজের আচার নিয়ন্ত্রিত গণ্ডী থেকে অব্যাহতি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁর মনে রোম্যান্টিকতার এষণা পূর্ণমাত্রায় ছিল। তার ফলে কোনও সুনির্দিষ্ট স্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে শান্ত থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনের এই গতিশীলতা তাঁকে পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ করেছিল। যে প্রেরণা বায়রণকে সমাজ ও দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, শেলীকে ঘরছাড়া করেছিল, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে যার ব্যর্থতা ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও কোলরিজের কল্পনাকে অন্তর্মুখী করে তাঁদের প্রতিভার অকালমৃত্যুর সূচনা করেছিল, সেই একই প্রেরণা মধুসূদনের অশান্ত বিদ্রোহী মনকে ধর্মত্যাগে, সংসারের স্বাভাবিক মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করতে প্রবুদ্ধ করেছিল। 'আলবিয়ন' তাঁর কাছে তখন 'এল্‌ডোরাডো' কিম্বা 'ইউটোপিয়া', আর খৃষ্টধর্ম ভারত ও 'আলবিয়ন'-এর মধ্যে স্বর্ণসেতু।

২৫শে নবেম্বর থেকে তিন মাস পরে বিবাহের দিন ঠিক হয়েছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধানে অপ্রশস্ত ; পৌষ মাস বিবাহের পক্ষে অকাল ; মাঘ মধুসূদনের জন্মমাস ; অগত্যা ফাল্গুনে মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ দিবেন, রাজনারায়ণ দত্তের এই অভিপ্রায়। যে সংস্কারকে মধুসূদন অবজ্ঞা করতেন, তারই মধ্যস্থতায় তিনি কয় মাস অব্যাহতি লাভ করলেন। অপর দিকে যে সংস্কারচক্রের সহিত রাজনারায়ণের সংসারচক্র আগে-ভাগে বাঁধা, সেই সংস্কারই তাঁর কাল হল। একেই বলে প্রকৃতির পরিহাস। এই তিন মাসে যবনিকার অন্তরালে অত্যন্ত সঙ্গোপনে ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলল। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের পটভূমিকায় তার প্রথম আভাস একটি হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থাপিত হল। ঘটনাটি সেই কৌতুক দৃশ্যের একজন নায়কের ভাষায় বলি :

"একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়া আসিয়াছি। ইহার জন্য এক

মোহর ব্যয় হইয়াছে।' মধু সেদিন ফিরিঙ্গির মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল, সম্মুখের চুলগুলি বড়, ঘাড়ের চুলগুলি ছোট। আমি বলিলাম, 'একি করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস (genius); জিনিয়াস্ যারা তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চূড়া কি সাত চূড়া কি নয় চূড়া করিয়া আসিতে, তা হলে যা হোক একটা নূতন রকমের কিছু হত। তা না করে ফিরিঙ্গীর মতন চুল ছেঁটে এসেছো, এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।' আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন সে আমার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম, এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না।" দেখা যাচ্ছে এই বহু নিন্দিত এক মোহরে চুল ছাঁটার ব্যাপারটি মধুসূদনের অমিতব্যয়িতার নিদর্শন নহে। একদিন ফিরিঙ্গীর বেশবিন্যাসে যে পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল, আজ কেশবিন্যাসে তারই সমাপ্তি হল।

পরদিন শোনা গেল মধুসূদন হিন্দু কলেজ থেকে সহসা অন্তর্হিত হয়েছেন। পিতামাতার উদ্বেগ অবর্ণনীয়; অনুশোচনা তাঁদের অবস্থাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই উৎকণ্ঠিত। রাজনারায়ণ দত্ত রাজকৃষ্ণ বসাকের নিকট সন্ধান করলেন—যদি গৌর কিছু বলতে পারেন। কিন্তু গৌরদাস কিছুই জানেন না; যতটুকু জানেন তা বলবার নয়, কারণ বললে তা আগেই বলা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে দিগম্বর মিত্রের নিকট শোনা গেল মধু আর দিগম্বরের ভাই মাধব মিত্র একসঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের গন্তব্যস্থল কেউ জানে না। তবে বিচ্ছিন্ন ঘটনার টুকরো অংশগুলি জোড়া

সাগরদাঁড়ি

হেহুয়া
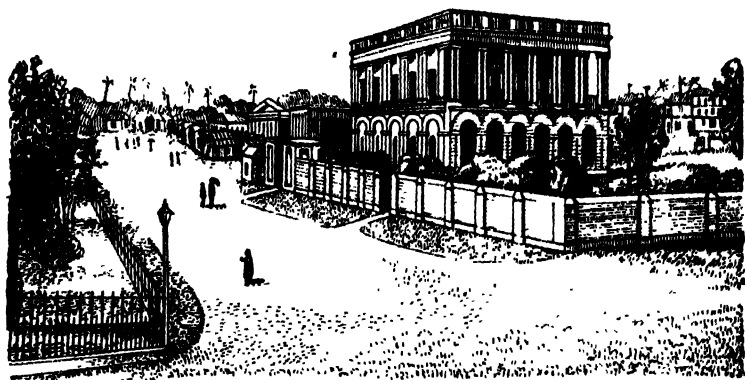
হিন্দু (ও সংস্কৃত) কলেজ

বিশপস্ কলেজ

ডেভিড হেয়ার

ডিরোজিও

এলেকজেণ্ডার ডাফ

ক্যাপটেন রিচার্ডসন

গৌরদাস বসাক

রাজনারায়ণ বসু

ভোলানাথ চন্দ্র

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোরী চাঁদ

বিটন্

আর্চ-ডিকন্ ডিয়াল্ট্রি
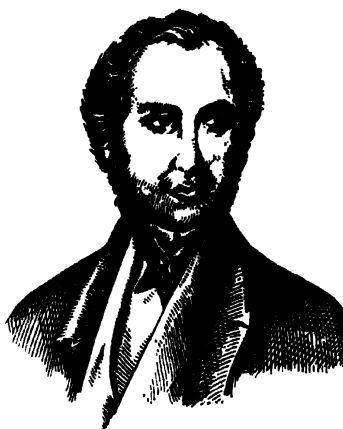
দিয়ে জানা গেল মধু খ্রীস্টান হবেন বলে পালিয়েছেন। এ সংবাদ শুনে সকলেই স্তম্ভিত। জননী জাহ্নবী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে পাগলিনী প্রায়; ক্রোধে, ক্ষোভে রাজনারায়ণ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। কলকাতার বিশিষ্ট জমিদারদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। সকলে মিলে লাঠিয়াল ও সড়কিয়ালা সংগ্রহ করে প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে মধুকে খ্রীস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। কিন্তু মধুসূদন কোথায়? সহরে হুলুস্থুল, চতুর্দিকে অনুসন্ধান চলছে, কিন্তু নাটকের নায়ক অদৃশ্য।

দু'একদিনের মধ্যে মধুসূদনের সহপাঠী গিরীশচন্দ্র ঘোষের মাতুলালয়ে রাজনারায়ণের বন্ধুবর্গেরা—(তাঁদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন)—জল্পনা-কল্পনা করছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সহসা সেখানে উপস্থিত হয়ে যে সংবাদ দিলেন তাতে বলপ্রয়োগ দ্বারা উদ্ধার করার আশা নির্মূল হল। তার মধ্যে সার কথা এই—মধু এইরূপ সম্ভাবনা আশঙ্কা করে ফোর্ট উইলিয়াম-এ আশ্রয় নিয়েছেন; সেখানে স্বয়ং মেজর পাউনির উপর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হয়েছে। একটি বাঙালী যুবককে খ্রীস্টান করবার সহায়তায় সমগ্র ব্রিটিশ ফৌজের শক্তি যেখানে নিয়োজিত, সেখানে বাহুবলে উদ্ধারের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু বলপ্রয়োগে যা অসম্ভব, হয়ত খাতিরে তা সম্ভব হতে পারে। এবার স্বয়ং ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল অগ্রসর হলেন। কেল্লায় প্রবেশের অনুমতি অবশ্যই তিনি পেলেন, কিন্তু মধুসূদনের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ তিনি পেলেন না। বিরক্তিভরে নীচে নেমে এসে দেখেন গৌরদাস ও ভূদেব উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের বললেন, অপেক্ষা করে লাভ নেই; শয়তানেরা সাক্ষাৎ করতে দেবে না। তবু তাঁরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সত্যশরণ চলে গেলে একজন গোরা এসে তাঁদের বলল দু'একদিন পরে আসতে, তখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। তদনুসারে পরদিন

গৌর বসাক, শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ও মধুসূদনের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র প্যারীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে কেল্লায় হাজির হলেন। কেল্লার গির্জাঘরে সৈনিক ও পাদ্রীর—তরোয়াল ও ধর্মপুস্তকের—সমবেত শক্তির সতর্ক প্রহরায় মধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সাবধানের মার নেই:—কি জানি, ধর্মের শক্তি যদি কমজোর হয়, উপযুক্ত হাতিয়ার হাতের কাছে থাকা ভাল। আগন্তুকেরা সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। কল্পনা করতে পারি প্যারীমোহন পিতামাতার করুণ অবস্থা, বংশের গৌরবের কথা মধুসূদনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন; রাম মিত্র মানবিক কর্তব্যের কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন নিশ্চয়; গৌর বসাক তাঁর নিকট বন্ধুত্বের দাবী, দেশের দাবীর কথাও সম্ভবতঃ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। মধু সব চুপ করে শুনলেন। তারপর হঠাৎ উঠে একটি ছোট্ট নমস্কার করে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর মনের কথা কে বলতে পারে? একি উদ্ধত অবজ্ঞা? একি উদ্‌গত অশ্রু-নিবারণের চেষ্টা? না এ চপলমতি যুবকের হৃদয়হীন তাচ্ছিল্য? ভগ্নদূতেরা হতাশ মনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শেষ চেষ্টা করলেন প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস বসাক একলা। দীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল ফেব্রুয়ারী ৯ তারিখে। তার অব্যবহিত পূর্বে তিনি একলা গিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। ডক্টর কর্‌বিন-এর ড্রয়িং রুম-এ মধুসূদন প্রিয় বন্ধুকে তাঁর স্বভাব-সুলভ আবেগ-ভরে সম্ভাষণ করলেন। সেদিন অনেক কথা হল,—হাস্য-পরিহাসে বন্ধু ঠিক পূর্বের মতই। কিন্তু তাঁর নবলব্ধ 'আলোক' সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা হল না। শেষে তাঁর দীক্ষার দিনে যে প্রার্থনাগীত সমবেত কণ্ঠস্বরে গীত হবার জন্য তিনি রচনা করেছিলেন, তা পড়ে শোনালেন। গৌর হবেন তাঁর জীবনীরচয়িতা, তাঁকে শোনানো প্রয়োজন বৈ কি! কিন্তু তাঁর মনের কথা? সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। যদি গৌরদাস কখনও তাঁর জীবনচরিত

লিখতেন, সে হত মধুসূদনের অতিপ্রিয় মুর্-এর সম্পাদিত ও সঙ্কলিত বায়রণের জীবনচরিত। তিনি যেখানে একান্তই মানুষ, সেদিকটা প্রচ্ছন্ন থেকে যেত। গৌরদাস তাঁর স্মৃতিকথায় টুকরো টুকরো অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষটা নেই কোথাও। কিছুক্ষণ পর করবিন এসে ইসারা করলেন. আলোচনা বন্ধ হল; গৌরদাস ক্ষুব্ধচিত্তে বিদায় নিলেন; মধুসূদন বিদেশীর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ সংবাদ রাজনারায়ণ দত্ত শুনলেন। হয়ত আশঙ্কার বিরুদ্ধে আশা করছিলেন স্নেহের টানে পুত্র ফিরবে; বিবাহ না-করবার জিদ্ বজায় রেখে মান-অভিমানের পালা শেষ করবে। এখন বুঝলেন বংশের গৌরব, ইহলোকের সম্বল, পরলোকের অবলম্বন তাঁর একমাত্র পুত্রকে ফিরে পাবার আর কোনও আশা নেই। আশা নেই, তার প্রতিকারও নেই,—অথচ আশঙ্কা রইল। বিধর্মী পুত্র পৃথক্-অন্ন হলেও তার ধর্মত্যাগজনিত কলঙ্ক, অশুচিতার গ্লানি তাঁকে নিশ্চয় স্পর্শ করবে; নিশ্চয় উজ্জ্বল বংশগৌরবকে ম্লান করে দেবে। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস বিলাত যাবার জন্যই পুত্র ধর্মত্যাগ করতে উদ্যত; তাই তিনি এক হাজার টাকা মধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন,—সে যেন অবিলম্বে বিলাত যাবার ব্যবস্থা করে; দুষ্কার্য যদি করতেই হয় কালাপানি পার হয়ে করাই তার কর্তব্য। মধুসূদন এ-টাকা ও এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ টাকায় বিলাতে গিয়ে খৃষ্টানও হতে পারতেন বিনা দ্বিধায়; কিন্তু কাপুরুষতার অপবাদ তাঁর সারাজীবনকে মসীলিপ্ত করত। মধুসূদনের ধর্মত্যাগের ও সমাজত্যাগের পশ্চাতে যে চারিত্রিক ও সামাজিক শক্তি কাজ করেছিল, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কার্যকলাপে যা চোখে পড়ে, সে তার চেয়ে অনেক গভীর স্তরের ব্যাপার, খৃষ্টান হওয়া বা বিলাত যাওয়া যার বাইরের প্রতীক মাত্র। আগ্নেয়গিরির বাইরের উৎক্ষেপ প্রচণ্ড হলেও তার সার পরিচয় নয়।

অবশেষে দিন এল: বৃহস্পতিবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩। ওল্ড মিশন্ চার্চ তাঁর দীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচার কার্যে এ গির্জাটির ঐতিহ্য ছিল। স্বয়ং গির্জাধিপতি আর্চডিকন ডিয়ালট্রি পৌরোহিত্য করবেন। সারা সকাল কেল্লা থেকে গির্জা পর্যন্ত রাস্তায় সৈন্যেরা টহল দিচ্ছে: কে জানে হিন্দুদের কি মৎলব—সাবধানের মার নেই! গির্জার বাইরেও কৌতূহলী দর্শকের অভাব নেই; এই আজব সহর কলকাতায় কতই না আজগুবি ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে হিন্দু কলেজের বাছাই করা প্রিয় বন্ধুরা বিষণ্ণচিত্তে অপেক্ষা করছেন; আজ তাঁদের মধ্যে যিনি 'জুপিটার' ছিলেন, যাঁকে নিয়ে তাঁদের গর্বের ও গৌরবের অন্ত ছিল না, সেই মধুসূদনকে চিরবিদায় দিতে হবে। অথচ এ মর্মান্তিক বিচ্ছেদের প্রয়োজন কি তাঁদের বুদ্ধির অগম্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তরুণ অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও কি কর্মস্থানে যাবার পথে এ দৃশ্য দেখেননি? তাঁর মনের ক্ষোভ ও বিক্ষোভ কারও অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু এই কি নিরসনের পথ? কিছুক্ষণ পরে ইংরাজ পাত্রা ও সৈনিক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে খোলা গাড়ীতে মধুসূদন গির্জায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে অগণিত গাড়ীতে গণ্যমান্য সাহেব-মেম এলেন। গির্জার মধ্যে সকলে প্রবেশ করলেন; দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

গির্জার ভিতরে অর্গ্যান বেজে উঠল; সমবেত দর্শকমণ্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে মধুসূদন রচিত ধর্ম-সঙ্গীতটি গাইলেন। ইংরাজ গাইছে শ্রদ্ধাভরে বাঙালী যুবক রচিত সঙ্গীত: এই চরম মুহূর্তে মধু যদি পাগলপ্রায় পিতা, ধূলিলুণ্ঠিতা মাতার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাঁকে আমরা দোষ দেব না। "খ্যাতির লোভ মহিমান্বিতেরও চরম দুর্বলতা।"

যথা নিয়মে দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হল। নির্বাচিত সাক্ষী হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্চডিকন নামকরণ করলেন

"Michael"—দেবদূত মাইকেল। নামকরণ শুনে হয়ত মধুসূদনের কানে বেজে উঠেছিল মহাকবি মিল্টন-এর বাণী :

> Go Michael, of celestial armies Prince,
> ...Lead forth to battle these my sons
> Invincible ; lead forth my armed saints
> By thousand and by millions ranged for fight,

হয়ত ডিয়ালটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এই প্রতিভাদীপ্ত বঙ্গযুবক একদিন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত অভিযান চালিয়ে এই কুসংস্কার-নিমজ্জিত দেশে সত্যকার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে—এঁদের নিষ্ঠা ছিল, অধ্যবসায় ছিল, পাণ্ডিত্য ছিল,—কিন্তু প্রতিভা কোথায়? প্রতিভার আগুনের ছোঁয়াচ না লাগলে চিত্তের আলো জ্বলে না। মধুসূদন সেই প্রতিভার বরপুত্র: তাঁর দ্বারা কি না সম্ভব?

—অলক্ষ্যে দেবতারা নিশ্চয় হেসেছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ততঃ কিং?

মধুসূদনের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হল। সিজারের মতন তিনি 'রুবিকন' পার হয়ে নৌকা পুড়িয়ে দিয়েছেন; প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ। আপনার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সৃষ্টি করলেন এক দুরতিক্রমণীয় লবণাম্বুধির ব্যবধান। প্রবাসী না হয়েও পরবাসী হলেন। প্রথমে তিনি কিছুদিন আর্চডিকন ডিয়ালট্রির গৃহে বাস করেছিলেন। কলকাতার খৃষ্টান সমাজে ডিয়ালট্রির স্থান মহামান্য লর্ড বিশপের পরেই। এঁর গৃহে অবস্থানের ফলে মধুসূদন উন্নত বিদেশী সমাজের আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচিত হলেন। তাঁর মানস-সংস্কারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য, যদিও এসব তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেনি। কিছুদিন পরে ওল্ড্ মিশন চার্চ-এর নিকটে রেভারেণ্ড হ্বন্-এর বাড়ীতে তিনি স্থানান্তরিত হলেন। সম্ভবতঃ এঁর উপর মধুসূদনের ধর্মশিক্ষাকে কায়েমী করবার ভার প্রদত্ত হয়েছিল। সে সময়ে শিক্ষিত ভারতীয় খৃষ্টানদের জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষকতা ও যাজকত্ব প্রধানতম উপায় ছিল। মধুসূদনের জন্যও এই রকম পরিণতি পরিকল্পিত হয়েছিল—যদিও পরমার্থ সম্বন্ধে তাঁর নিঃস্পৃহতা রিচার্ডসন-এর প্রিয় ছাত্রেরই উপযুক্ত। কিন্তু এভাবে পরভৃতিক হয়ে জীবন যাপন করা তো বেশী দিন চলতে পারে না; এ জীবন ত তিনি কামনা কিম্বা কল্পনা কোনও দিন করেননি। যিনি পিতামাতার অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে চিরাভ্যস্ত, তাঁর পক্ষে আর্থিক ব্যাপারে পরানুগ্রহের উপর নির্ভরতা কতটা অসহনীয় হয়েছিল তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। তা সত্ত্বেও আপাততঃ অনন্যোপায় হয়ে তিনি এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা মেনে নিলেন। বোধ হয় এই অবস্থাজনিত অতৃপ্তিই কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবে পিতামাতার সহিত মিলনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

ঘটনার চক্র শীঘ্রই তার অনুকূলে আবর্তিত হল। এই সময়ে রেভঃ কে. এম্. ব্যানার্জির সহায়তায় তাঁর হিন্দু কলেজের প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হল। শুধু গৌর বসাক নয়, ভূদেবও মাঝে মাঝে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে সুরু করলেন; এমনি অসাধারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। এর ফলে তাঁর খণ্ডিত জীবন কতকটা পূর্ণতর হল। একদিকে ইঙ্গ-সমাজের সুমার্জিত আদব-কায়দা-দুরস্ত জীবনধারায় অংশ গ্রহণ করে তিনি বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত; অপরদিকে হিন্দু কলেজের প্রিয় বন্ধুদের সহিত প্রাণখোলা মন বিনিময়ের সুযোগে তিনি প্রফুল্লতা ফিরে পেলেন। মর্ম-সচেতন, মননশীল মানুষের পক্ষে বৈপরীত্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করায় শুধু আনন্দ নয়, যথেষ্ট উদ্দীপনা আছে। উভয় সমাজের শ্রেষ্ঠ সুবিধা এখন তাঁর করায়ত্ত। এখন আর্থিক অবস্থার সুরাহা হলেই তাঁর কোনও অভাবই থাকবে না। জাত্যাভিমান বিসর্জন না দিয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টার সব পন্থাকেই মধুসূদন গ্রহণীয় বলে মনে করতেন। খিদীরপুরে তাঁর নাগালের মধ্যে রয়েছে কল্পতরু; একবার হাত বাড়ালেই হয়। রাজনারায়ণ হয়-ত তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু জাহ্নবী দেবী পুত্রকে ফিরে পাবেন এই আশা নিয়ে বসে আছেন, নইলে বৃথাই তাঁর দেবতার পায় অর্ঘ্য-নিবেদন। এইবার নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মধুসূদন মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন। প্রথম প্রথম গোপনে সাধারণের অগোচরে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন; তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, নিজেও মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করতেন: তার স্থূল নিদর্শনও কি পকেটে হাত দিলে অনুভব করতেন না? এই ভাবে প্রথম সঙ্কোচটা সহজ হয়ে যাবার পর প্রায়ই এবং বেশ খোলাখুলিভাবেই যাতায়াত করতেন। ক্রমশঃ রাজনারায়ণের ক্রোধও অনেকটা প্রশমিত হল। তিনি দেশী-বিদেশী উভয় সমাজেই সুপরিচিত; তাঁর পুত্র পরানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এটা তাঁর মতন মানী ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় অপমানকর। তা ছাড়া,

জাহ্নবী দেবীর প্রতি তাঁর প্রীতি-শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। বিধর্মী পুত্রের আচরণে যেখানে সহধর্মিণী খুসী, সেখানে তাঁর ক্ষোভ কিম্বা অভিমানের ঠাঁই কোথা? অতএব অচিরে তিনি পুত্রের ভরণপোষণের সমুদয় খরচপত্র বহন করতে রাজি হলেন। এই বদান্যতার ফলে মধুসূদন হ্বন্-এর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করে ডেকার্স লেনে জনৈক স্মিথ সাহেবের বাড়ীতে খাই-খরচ দিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই গৃহের পরিবেশ মধুসূদনের নিকট অনেক বেশী প্রীতিকর। টমাস স্মিথও ধর্মযাজক কিন্তু শেক্স্পীয়র-সাহিত্যে অনুরক্ত; সাহিত্যের প্রতি দরদ তাঁর যথেষ্ট। তদুপরি তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর সম্পাদক। পত্রিকা-সম্পাদনে মধুসূদনের হাতে খড়ি কি এই খানেই হয়েছিল? মধুসূদন তাঁর নিকট শেক্স্পীয়র অধ্যয়ন করতেন। মাঝে মাঝে সাহেবের আমন্ত্রণে গৌর বসাকও তাঁদের এই পাঠ-সভায় যোগ দিতেন।

এত বিপর্যয়ের মধ্যেও মধুসূদনের কাব্যচর্চা বন্ধ হয়নি। বরং খৃষ্টান হয়ে তাঁকে আরও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে, যে তাঁর ধর্ম পরিবর্তন নিষ্ফল হয়নি। এ বৎসর (১৮৪৩) সেপ্টেম্বর মাসে 'লিটারারি গ্লীনার'-এ তাঁর 'কিং পোরাস'—পুরুরাজ—নামে একটি কাব্য প্রকাশিত হল। মধুসূদন পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু পিতৃপুরুষের শৌর্যবীর্য তাঁর মনে কখনও ম্লান হয়নি; পরাধীনতার গ্লানিও তিনি বিস্মৃত হননি:

> But where art thou, fair Freedom! thou—
> Once goddess of Ind's sunny clime?
> When glory's halo' round her brow
> Shone radiant, and she rose sublime.

[—হে সুন্দরী স্বাধীনতা, তুমি আজ কোথায়? একদিন তুমি রৌদ্রস্নাত ভারতভূমির অধীশ্বরী দেবী ছিলে; তখন তার ললাটে গৌরবমালা শোভা পেত; সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াত।]

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দে মুন্সিয়ানা হয়ত আছে, কিন্তু অলঙ্কার ধার-করা ও কাহিনীতে মৌলিক কল্পনার যথেষ্ট অভাব দেখা

যায়। তবে ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর পরিচিতির ব্যাপকতা ধরা পড়ে শব্দ সঞ্চয়নে ও উপমা প্রয়োগে। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন ও বায়রণ এখনও তাঁর ভাবসংগ্রহের প্রধান আকর; মুর্‌ প্রায় অন্তর্হিত, কীট্‌স্‌-এর প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ছে। ধ্বনির চেয়ে প্রতিধ্বনির, ভাব অপেক্ষা প্রভাবেরই প্রাধান্য বেশী। এ ধরণের রচনার একমাত্র সার্থকতা বিষয় নির্বাচনে ও ভাবাদর্শে, যা-থেকে তাঁর দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ আমরা জানতে পারি। বিদেশীয়দের আশ্রয়ে থেকেও তিনি যে ভারতের সন্তান এ কথা তিনি বিস্মৃত হননি।

মানসকেন্দ্রে ভারতবর্ষের আকর্ষণকে অক্ষুন্ন রেখে, আচার-ব্যবহারে নূতন সমাজের উচ্ছল আনন্দে মধুসূদন গা ভাসিয়ে দিলেন। আজ পার্টিতে নিমন্ত্রণ, তাতে সময়োচিত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যেতে হবে; কাল ড্রয়িং-রুমের বৈঠকী আলাপে যোগ দিতে হবে; নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশার অফুরন্ত সুযোগ; নানা লোভনীয় আতিথ্যগ্রহণের আনন্দ;—হাস্যে-লাস্যে, লঘু ছন্দে দিনগুলি হাল্কা ঢেউ তুলে ভেসে চলেছে; হিন্দু সমাজের বৈচিত্র্যহীনতার গ্লানি নেই; সাংসারিক জীবনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেই; জীবিকার্জনের কোনও প্রয়োজন বা তাগিদ্‌ নেই: আছে শুধু বর্তমানের রঙীন নেশা, আর ভবিষ্যতে, 'এল্‌ডোরাডো'-র মধুর মায়া: মধুসূদনের পক্ষে এই ত স্বর্গ,—ওয়া হামীন্‌ অস্ত্‌।

মানুষ আশা ছাড়া থাকতে পারে না। নৈরাশ্যের দম-আটকানো আবহাওয়ায় অন্তরাত্মা হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু যেমনি এর মধ্যে একটু আশার স্নিগ্ধ সমীরণ বহে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কত শত মনোরম বাসনা মুকুলিত হয়ে আনন্দের সৌরভে মনকে ভরে দেয়। মধুসূদনের হাসি-খুসী মেজাজ দেখে জাহ্নবীর অন্তর এক অভাবনীয় আশার সম্ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠল। পুত্রের আচরণে তাঁর মনে হল তাঁদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা বুঝি বা বিন্দুমাত্র কমেনি। তবে কি তাঁকে পুনরায় বুকের মধ্যে ফিরে পাওয়া যাবে? হিন্দু-

সমাজ সঙ্কীর্ণ বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম ত অনুদার নয়। ঘোরতর পাপীর উদ্ধারকল্পেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে: তাঁদের সন্তান ত শুধু ভ্রান্তি অথবা জেদ অথবা মোহের বশে বিপথগামী হয়েছে। এ সম্ভাবনার আশা রাজনারায়ণকেও ক্রমে উৎসাহিত করে তুলল। জাহ্নবীর দাবী শুধু মাতৃহৃদয়ের; রাজনারায়ণের দাবী বংশগত অনুপেক্ষণীয় ঐতিহ্যের। বাস্তবিক, হিন্দুর পক্ষে অপুত্রক জীবন নরকতুল্য। সমাজে মধুর প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলেই তিনি এই নরক যন্ত্রণার বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আর কলকাতায় কে না জানে সমাজ নিতান্তই অর্থ ও প্রতিপত্তির দাস। রাজনারায়ণের অর্থও আছে, প্রতিপত্তিও আছে। ভাগ্যের ছকে পাশার একটি দানে বাজিমাৎ হলে চাই কি যা গিয়েছে তার চতুর্গুণও ফিরে আসতে পারে।

আসল কথা মধুর অশান্ত মনকে জয় করতে হবে। এখন এই কাজে রাজনারায়ণ আত্মনিয়োগ করলেন। পুত্রের সব দুষ্কৃতি ভুলে গিয়ে তাকে বাগে আনতে হবে। রাজনারায়ণ পাকা সংসারী। তিনি বেশ জানেন টাকা থাকলে সবই হয়। নূতন সমাজে মধুসূদনের 'প্রেষ্টিজ' নির্ভর করে তাঁর দৌলতের উপর। রাজনারায়ণের কাছ থেকে অর্থ পেলেই তাঁর নূতন সমাজে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন থাকবে, খুসীতে মন ভরে থাকবে। এই খুসীর পথ দিয়েই একদিন তাঁর অন্তরে প্রবেশ করবে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এখন খিদীরপুরের বাড়ীতে মধুসূদন প্রায়ই আসেন। স্পর্শদোষ অবশ্য বাঁচিয়ে চলতে হয়, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসায় ও রজতকাঞ্চনে স্পর্শদোষ ঘটে না। তাই ঘরে যেমন আদর-আপ্যায়নের অভাব নেই; তেমনি বাইরেও বাসনা চরিতার্থের কোনও বাধা নেই। এই সেদিন শুনলেন রিচার্ডসন দেশে ফিরে যাচ্ছেন; সদা অভাবগ্রস্ত এই গুরুর কাছে তাঁর ঋণ ত কম নয়। ছাব্বিশ টাকা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে চারখানা বই কিনে পরিতুষ্ট হলেন। বন্ধুবান্ধবেরা আসা-যাওয়া করে: সাহেবের বাড়ীতে

পদব্রজে এলে তাঁর মান থাকে না, তাই তাঁদের পাল্কী করে আসতে অনুরোধ করেন। "লাগে পয়সা আমি দেব", "আমার হাতে যথেষ্ট টাকা আছে",—অর্থসম্বন্ধে এই পরম পরিতৃপ্তির সুর মধুসূদনের জীবনে এই একবারই শোনা গিয়েছিল।

সহসা একটা অভাবনীয় প্রস্তাব শোনা গেল: মধুসূদন গৌরকে লিখছেন, "আমি শীঘ্রই খিদীরপুরে বাপ-মায়ের কাছে, অর্থাৎ সান্নিধ্যে, গিয়ে বসবাস করব।" অবস্থার এতটা পরিবর্তন দু'একদিন আগে কে-ই বা কল্পনা করেছিল। রাজনারায়ণের নাকি তাঁর বিলাত যাওয়ায় বিশেষ আপত্তি নেই। তবে একটা সর্তে—ডিয়াল্ট্রির সঙ্গে কোনও মতেই যাওয়া চলবে না। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ঘরে বাইরে সকলেই ডিয়ালট্রির প্রতি বিরূপ। চিঠিতে ডিয়ালট্রির সঙ্গে বন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎকারকে গৌর 'অশুভ মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেছিলেন। মধু অবশ্য তখনই এই ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন: "তোমরা কি মনে কর ডিয়ালট্রি আমাকে ধর্মত্যাগে প্ররোচিত করেছেন? কি করুণ, কি সাংঘাতিক ভুল।" কিন্তু তা হলেও পিতার অনুরোধে তিনি ডিয়ালট্রির সঙ্গ ত্যাগ করতে সম্মত হলেন: একরকম ঠিক হয়েছে আগামী শীতকালে বিলাত যাবেন একাকী—নিশ্চয় পিতৃদত্ত অর্থানুকূল্যে। রাজনারায়ণের মতলবটা কি? একি শুধুই সুমিষ্ট আশ্বাসে শিশুর মন ভোলাবার চেষ্টা?

যাই হোক, রাজনারায়ণ ও জাহ্নবীর সন্তুষ্টির সীমা নেই। এক বছর যেতে না যেতে যে এতটা সম্ভব হয়েছে,—শয়তানদের হাত থেকে সন্তানকে উদ্ধার করবার সম্ভাবনা আজ যে হাতের নাগালে পৌঁছেচে,—এ এক অলৌকিক ব্যাপার। অবশ্য মা জগদম্বার কৃপা থাকলে সবই সম্ভব হয়। সাধে জাহ্নবী দেবী দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে মায়ের পায়ে পূজা দিয়েছেন। সাধে রাজনারায়ণ দত্ত শত শত বলির রুধির-ধারায় মায়ের মন বৎসরের পর বৎসর

ভিজিয়ে দিয়েছেন। জগৎ-জননী ভক্তের কাতর আবেদনে একদিন মুখ তুলে চাইবেন না, এও কি কখনও হতে পারে? চতুর্দিকে অধর্মের প্রাবল্যে মায়ের মন বিরূপ বটে, কিন্তু তা সত্বেও ধর্ম আছে। যেখানে ধর্ম সেখানে জয়, এ দ্বাপরেও সত্য, কলিতেও সত্য। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে মধুসূদনের পিতামাতার মন এক মহতী আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল।

আগ্নেগিরি বাহিরে থেকে দেখা যায় শান্ত, অচঞ্চল। কিন্তু মাঝে মাঝে তার চাপা গর্জন শোনা যায়; থেকে থেকে আগুনের আচমকা ঝলকানি আতঙ্ক সৃষ্টি করে; জানিয়ে দেয় যে, সে এখনও নিভে যায়নি; অতটা ভরসা করা ভাল নয়। মধুসূদনের বাইরের আচরণে হয়ত পরিবর্তন হয়েছে; তাঁর বিদ্রোহের উগ্রতা হয়ত অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তরের চাপা আগুন প্রায়ই ছোটখাটো কথায় বা সামান্য ঘটনার মধ্যে সহসা ক্ষণেকের তরে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। যেমন একদিন গৌরদাস তাঁর একখানি চিঠিতে, হয়ত মনের দুঃখে, লিখে ফেলেছিলেন, "আমার খৃষ্টান বন্ধু মধুসূদন দত্তের সমীপে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—সংক্ষিপ্ত, ঝাঁঝালো,—ওরকম লিখ না, "ওটা আমি পছন্দ করি না।" তাঁর আচরণের প্রতি সামান্য কটাক্ষও তাঁর কাছে অসহ্য। আর একদিন খৃষ্টানদের কোনও অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তাঁকে ষোলোখানা টিকিট দেবার কথা ছিল, কিন্তু পেলেন মাত্র আটখানা: ফলে গৌরকে তিনখানার বেশী দিতে পারলেন না। কিন্তু বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন, "এ আমি চুপ করে কখনই সহ্য করব না। এতটা বিশ্বাস-ঘাতকতা! এতটা মিথ্যাচরণ! এতটা জঘন্য ব্যবহার!" এ ঠিক সাধারণ বাঙালীর আপোষোন্মুখ মন নয়। এ যেন আগুনে পোড়া ইস্পাতের তরোয়াল, এমনি মখমলের খাপে ঢাকা পুরুষের পোষাকী অলঙ্কার, কিন্তু একটুতেই তার নিষ্কাশিত রোষ ত্রাস সঞ্চার করে। মধুসূদন সব কিছু সহ্য করতে প্রস্তুত,—কিন্তু নিজের সর্তে।

বাস্তবিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের মন বুর্জোয়া আর্টিষ্টের নৈর্ব্যক্তিক আত্মসর্বস্ব অহংবাদী মন, যাকে বিশ্লেষণ ক'রে বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন, "বিশুদ্ধ আর্টিষ্ট-এর দয়ামায়া বলে কিছু নেই। আর্ট-এর দোহাই দিয়ে সে নিজের জন্য আহরণে ওস্তাদ, কিন্তু প্রতিদানের প্রয়োজন বিন্দুমাত্র অনুভব করে না। ঘরে তার বউ অনাহারে থাক্, ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খালি পায়ে ঘুরে বেড়াক, বুড়ো মা দিনের পর দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার জন্য রোজগার করুক: নিজের আর্ট ছাড়া সে কিছু জানেও না, মানেও না।...সারা দুনিয়া উৎসন্নে যাক্, হাজার হাজার নরনারী শুকিয়ে মরুক, যদি তার ফলে সে একটি 'হ্যামলেট' চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে, একখানি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখতে পারে, অথবা একটি সার্থক নাটক রচনা করতে পারে।" অর্থাৎ সর্ববন্ধনমুক্ত ব্যক্তিত্ববাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সমাজের চরম পরিণতি যে রূপসর্বস্বতায় পর্যবসিত, তারই অগ্রদূত হয়ে আবির্ভূত সেই আর্টিষ্ট যে নিজের কল্পনা-রূপায়ণের বেদীমূলে নিজের সামাজিক চেতনাকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সূচনার দিকে, যে পর্যন্ত এই মনোভাব মানস-মুক্তি ও গণ্ডি-বিমোচনের পথপ্রদর্শক, সে পর্যন্ত সাহিত্যে এর বিশিষ্ট স্থান আছে, এই নূতন আদর্শ সমাজের মধ্যে নূতন করে প্রাণ সঞ্চার করে। কিন্তু সমাজের অবক্ষয়ের মুহূর্তে এই মনোভাব শিল্পের অপমৃত্যু ঘটায়। তাই আমাদের দেশে নূতন যুগমানসের জন্মক্ষণে আমাদের সাহিত্যে আত্মচেতনার পরিমণ্ডলের কেন্দ্রে মধুসূদন প্রাণ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনার অভাব সত্ত্বেও।

সামন্ত-যুগ-ধর্মিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত এই নবজাত বুর্জোয়া আর্টিষ্ট-এর প্রকৃতি বুঝবেন কি ক'রে? পুত্র খৃষ্টানদের অবাঞ্ছিত অভিভাবকত্ব ত্যাগ করে চলে আসতে রাজি হয়েছেন; গৌরের

কাছে নিশ্চয় শুনেছেন, তাদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ছোটোখাটো অভিযোগে যেন তাঁর একটা মানসিক পরিবর্তনের সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; বিশেষতঃ তাঁর ইংলণ্ডে যাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। তা ছাড়া, সমাজের পরিবেশেও একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিসীম চেষ্টার ফলে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে একটা সুনিয়ন্ত্রিত মনোভাব গড়ে উঠেছে। বিপথগামী যুবকদের ঘরে ফিরিয়ে আনবার কথাও লোকে চিন্তা করছে। জনৈক চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টানুরক্তি দেখে গুপ্তকবি লিখলেন:

পূর্ববৎ হিন্দু হও যিশুমত খণ্ডি।
হাড়ি ঝী চণ্ডীর আজ্ঞা ঘরে আয় চণ্ডী।

"স্বধর্মে ফিরিয়া আসিবার এই আহ্বান সেযুগে প্রতিরক্ষণশীল হিন্দুর আহ্বান" (সুনীল গুপ্ত)।

এইসব আপতিক শুভ সংকেত দেখে রাজনারায়ণ অনেকদিন পরে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাকা রসুইয়া যেমন ফুটন্ত জলে দু'একটা ভাত পরখ করলেই চাল সুসিদ্ধ হয়েছে কি-না বুঝতে পারেন, রাজনারায়ণও তেমনি এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার তাৎপর্য যাচাই করে একরকম নিশ্চিন্ত হলেন যে, পুত্রের মন এখন বেশ নরম হয়েছে; এইবার প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাবটা তাঁর কাছে উত্থাপন করা যায়। ইতিমধ্যে তিনি এ সম্পর্কে অনেক অনুকূল বিধান সংগ্রহ ক'রে পরিবেশ প্রস্তুত করেছেন। পুত্র রাজি হলে সমাজে আর বিশেষ বাধা উঠবে না। কাশী থেকে পণ্ডিতেরা মত দিয়েছেন; কলকাতার সমাজও বিরূপ নয়। ব্যবস্থা অভিনব বটে, কিন্তু অশাস্ত্রীয় নয়।

কিন্তু প্রস্তাবটি উত্থাপন মাত্র সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। জনৈক আত্মীয়ের ভাষায়, "মধুসূদন কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি একবার পিতাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যদি সূর্য

পশ্চিমদিকে উদয় হয়, তাহা হইলেও তিনি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করিবেন না। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না।" ঘরে ফিরতে রাজি আছেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করে? কখনই না। কারণ প্রগতিশীল মনের পক্ষে পশ্চাদপসরণ করা অসম্ভব। গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক ঈশ্বর গুপ্ত ও ব্যক্তিসচেতন মধুসূদনের মেজাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ঈশ্বর গুপ্ত এক পা অগ্রসর হন ত দশ পা পিছিয়ে আসেন। কিন্তু মধুসূদন গোষ্ঠীর নাগপাশ ছিন্ন করে একদিন যে অভিযানে বের হয়েছিলেন, সে অগ্রগামিতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। অবশ্য এখনও ঠিক বোঝেননি যে, ধর্ম পরিবর্তন মানে অগ্রগমন নয়, এটা শুধু স্থান পরিবর্তনেরই সামিল। একদিন যখন এ তত্ত্ব বুঝলেন তখন খৃষ্টান গির্জামিকেও অস্বীকার ক'রে নিজের কাব্য সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন; বুঝলেন ধর্ম, সমাজ সবই বাহ্য; একমাত্র সত্য মর্মসচেতন কবি-মানসের আত্মনির্ভরতা। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এই উপলব্ধি হয়েছিল। যৌবনে যদিও মধুসূদন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবেদনে উদ্রিক্ত হয়েছিলেন, তথাপি অনুকূল পরিবেশের অভাবে, তিনি এই নূতন চেতনার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেননি, যেমন পেরেছিলেন শেলী,—কিম্বা হুইটম্যান:

> গাহি 'অহং'-এর গান।
> যে অহং সহজ, সাবলীল, স্বাধীন;
> প্রাণ আছে যতদিন দেহে আমি হব জীবনের রাজা;
> কভু ক্রীতদাস নহে।

এ বিদ্রোহের সুর তাঁর কাব্যে কখনও শোনা যায় নি।

মধুসূদনের পিতামাতা এতদিন ধরে যে মনোরম তাসের ঘর গড়ে তুলেছিলেন, এক ফুৎকারে তা ধূলিসাৎ হল। পুত্রকে বুকের মধ্যে ফিরে পাবার সব আশা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এর পরে

জাহ্নবী দেবীর জীবনে আর দীপ্তি নেই; আছে শুধু দম আটকানো ধোঁয়া, তার মধ্যে বেঁচে থাকা মানে মরণের জন্য অপেক্ষা করা মাত্র। শুধু মাঝে মাঝে যদি পুত্রের দেখা পান, শুধু মাঝে মাঝে যদি তার ছোটখাটো আব্দার পূর্ণ করতে পারেন, আজ 'এর চেয়ে নাহি তাঁর অধিক সম্পদ'। কিন্তু রাজনারায়ণের কথা আলাদা। তিনি পুরুষ মানুষ; তাঁর পারিবারিক কর্তব্য আছে, ভবিষ্যতের চিন্তা আছে। ইহকালের আশা ব্যর্থ হলেও পরকালের দায়িত্ব আছে। প্রকৃত হিন্দু এ দায় ও দায়িত্ব উপেক্ষা করবেন কি করে? জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি হয়ত কোনও মতে কষ্টে-সৃষ্টে কেটে যাবে, কিন্তু তারপর? মরণের পরেও আছে অন্ত্যেষ্টির প্রয়োজন; আছে শ্রাদ্ধ-শান্তির দাবি-দাওয়া, আছে নিরালম্ব বিদেহী আত্মার তাপ-তর্পণ। হিন্দুর পক্ষে পুত্রের প্রয়োজন অপরিহরণীয়। তার জীবনের দিনগুলি সংস্কারের শৃঙ্খলে দৃঢ় সম্বদ্ধ। রাজনারায়ণ দত্ত বিগত দিনের অনুশোচনায় কালক্ষেপ করতে পারেন না, জীবনের মাঝে মৃত্যুকে বরণ করতেও পারেন না। নূতন আশায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি ধর্মতঃ বাধ্য।

কিন্তু তার আগে জাহ্নবীপুত্রের জন্য একটা কায়েমী ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি রাজনারায়ণের শ্রদ্ধা, ভালবাসার অবধি ছিল না। পুত্রশোকাহত পতিগতপ্রাণ সহধর্মিণীর প্রিয় কার্য সাধন তাঁর কাছে অবশ্য কর্তব্য। অতএব অন্য চিন্তার পূর্বে মধুসূদনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত তাঁকে করতেই হবে, তাঁর অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপনের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিশপ্‌স্ কলেজ

খৃষ্টান মধুসূদন হিন্দু কলেজে ফিরে যেতে পারেন না। তখনও খৃষ্টান ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের পুত্রকন্যার উচ্চ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়নি। যে পর্যায়ের স্কুল ছিল, মধুসূদনের শিক্ষা সে পর্যায় অতিক্রম করেছে। এদের জন্য উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান গঙ্গার ওপারে বিশপ্‌স্ কলেজ। এই কলেজটি ১৮১৯ সালে বিশপ্ মিড্‌ল্‌টন্-এর উদ্যোগ ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গঙ্গার ওপারে বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাঙ্গণে কলেজের গৃহনির্মাণ করেছিলেন সেকালের স্বনামধন্য ইংরাজ "গুরু" জোন্স্। এইটিই ভারতবর্ষে বোধ হয় প্রথম 'গথিক' শিল্পের অনুযায়ী সুরম্য বহুচূড়া-বিশিষ্ট অট্টালিকা। কলেজটির উদ্দেশ্যে ছিল ভারতীয় খৃষ্টানদের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রয়োজনে একটি ধর্মযাজক সম্প্রদায় গড়ে তোলা। এই কারণে প্রথমদিকে অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হত যে, শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রেরা ধর্মযাজকত্ব গ্রহণ করবে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সর্তে বিশপ্‌স্ কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন ও পরে অধ্যাপনা করেছিলেন, এবং পেশা হিসাবে গির্জার পৌরোহিত্য বরণ করে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি এ নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল, এবং অল্প সংখ্যক ছাত্রকে এই বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নূতন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজনারায়ণ মধুসূদনকে এই কলেজে ভর্তি করে দিলেন। মধুসূদনের জন্য তিনি ১০০৲ টাকা মাসহারা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন: ৬৫৲ টাকা কলেজের বেতনাদি বাবদ; বাকিটা তাঁর হাত খরচ। সে যুগের বিচারে একে রাজকীয় ব্যবস্থা বলতে হবে।

বিশপ্‌স্‌ কলেজের পাঠ্যানুক্রম ও অধ্যাপনার রীতি বিলাতের সুবিখ্যাত অক্‌স্‌ফোর্ড-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ ছিল। বাইবেল অবশ্য প্রধান পঠিতব্য বিষয় ছিল, কিন্তু প্রকৃত ধর্মশিক্ষার অনুরোধে ছাত্রদের গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু শিখানো হত, কারণ মূল বাইবেল ও তার প্রামাণিক ভাষ্যগুলি এই সব ভাষায় রচিত। ভাষা শিখতে হলে সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য অধ্যয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মধুসূদন গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রাচীন ইউরোপীয় ক্ল্যাসিক্‌স্‌-এর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করলেন। ল্যাটিনের ভিত প্রতিষ্ঠা আগেই গ্রামার স্কুলে হয়েছিল; আমরা দেখেছি হিন্দু কলেজে তিনি ইউট্রোপিয়াস্‌ লিখিত ইতিহাস পড়ছেন ও বন্ধুদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ভাষাবিদ্‌ হয়েছিলেন বিশপ্‌স্‌ কলেজে। তিনি এখানে সংস্কৃত ভাষাও অনুশীলন করতেন, এবং এখানকার মাদ্রাজী সহপাঠীদের নিকট কিছু কিছু দ্রাবিড় ভাষাও শিখেছিলেন। মিল্টন্‌, ল্যাণ্ডর্‌ ও সুইন্‌বার্ণের মত মধুসূদন বহুভাষাবিদ্‌ কবি ছিলেন।

সে যুগে বিশপ্‌স্‌ কলেজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল তার অতুলনীয় পুস্তকাগার। এ ধরণের সংগ্রহ সেকালে কলকাতার অন্য কোথাও ছিল না। এই সমৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেসে মুদ্রিত যাবতীয় পুস্তক একটি চুক্তি অনুসারে প্রকাশমাত্র এই কলেজকে উপহার দেওয়া হত। এইজন্য ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনেক মূল্যবান বই এই লাইব্রেরীতে ছিল। মধুসূদন এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কার্লাইলের উক্তি—"আজ-কালের দিনে সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমৃদ্ধ পুস্তকসংগ্রহ"—এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে মধুসূদন ভারতবর্ষে বসে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এই একাগ্র অনুশীলনের ছাপ পরবর্তী কালের বাংলা কাব্য বহন করছে। বস্তুতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বভাব-কবি অপেক্ষা বিদগ্ধ কবির যে সমাদর তার জন্য আমরা মধুসূদনের নিকট ঋণী।

বিশপ্‌স্ কলেজে যখন দস্তুরমত খৃষ্টানী শিক্ষায় সমর্পিত, তখনও মধুসূদন তাঁর হিন্দু কলেজের বন্ধুদের বিস্মৃত হননি। গৌরদাসকে অবিরাম চিঠি দিতেন, আমন্ত্রণ করতেন, ভূদেব, স্বরূপ প্রভৃতি সহপাঠীরা প্রায়ই এসে দেখাশোনা করতেন। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে বন্ধুদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। একজন বন্ধুর পরীক্ষা আসন্ন, তাঁকে লিখছেন, "তুমি এখানে এসো এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।" গৌরদাসের সরকার কি যেন একটা বিপদে পড়েছে, তার জন্য যথাসম্ভব সুপারিশ করবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছেন। বোধ হয় তাঁর খ্যাতিও চারিদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে যিনি তাঁর নাট্যচরিত্র অভিনয় করে সাধুবাদ পেয়েছিলেন) একটি মনোজ্ঞ বিবরণে লিখছেন: "বিশপ্‌স্ কলেজে আমাদের মাইকেলের সঙ্গে দেখা হল। মনে ল তিনি যেন এই সাক্ষাতে বিশেষভাবে খুশী হয়েছেন। তিনি অশেষ আগ্রহ ভরে কলেজের বিভিন্ন ঘরগুলি আমাদের দেখালেন। তারপর আমাদের সঙ্গে নৌকায় এসে প্রায় এক ঘণ্টা কাটালেন। রাত্রি হলে আমরা পরস্পরের নিকট বিদায় নিলাম। তখন তাঁর বয়স ২২ কি ২৩। আমাদের এই স্বল্পকালীন আলাপে আমরা একটি মহৎ অন্তঃকরণের নির্ভুল পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখশ্রী, মনোহর আচরণ, প্রাণখোলা আলাপ, উত্তর-প্রত্যুত্তরে তৎপরতা, এবং সর্বোপরি সাহিত্য বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সব কিছু তাঁকে তখনকার দিনের সাধারণ শিক্ষিত জনের বহু উর্ধ্বে স্থাপন করেছিল, এবং আমার মনে এমন একটা রেখাপাত করেছিল যা চিরদিন অম্লান আছে।"

মধুসূদন বিদেশী সংস্কৃতি ও সভ্যতার একান্ত এবং অনেক সময় নে হয় অশোভনভাবে অনুগামী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও দন কোনও বিদেশীর কাছে তাঁর আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। ার সাজাত্যবোধ অনেকের চেয়ে প্রখর ছিল। গৌরকে লিখছেন,

"হয় এম্. এস্. ডাট্ এস্কোয়ার লিখবে, না-হয় শুধু 'বাবু' লিখ।" 'মনেপ্রাণে' সাহেব হয়েও 'বাবু' হতে তাঁর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। কিন্তু জগাখিচুড়ি চলবে না। আলাপ-আলোচনায় মধুসূদন নিজে বিশুদ্ধ ইংরাজি কিংবা বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করতেন। এর ব্যতিক্রম তাঁর রুচিকে আঘাত করত। তাঁর এই সাজাত্যাভিমান আরও উগ্রভাবে প্রকট হয়েছিল বিশপ্স্ কলেজে দেশীয় ছাত্রদের নানাপ্রকার বিসদৃশ বৈষম্যমূলক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে। কলেজে প্রবেশ করবার পরই তিনি দেখলেন ইংরাজ ছাত্রদের জন্য যে কলেজীয় পোষাক নির্দিষ্ট ছিল তা এদেশীয়দের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। মধুসূদন তৎক্ষণাৎ এ নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন: তাঁকে 'হয় কলেজের পোষাক পরতে দিতে হবে, না হয় দেশীয় পোষাক অনুমোদন করতে হবে।' বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষেরা শেষোক্ত প্রস্তাবকে অনুমোদন করা অধিকতর সমীচীন বলে মনে করলেন। পরদিন দেখা গেল মধুসূদন বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলেন: তাঁর পরিধানে সাদা রেশমী কাবা, মাথায় রঙীন পাগড়ী, অঙ্গে বিচিত্র কাজ করা কাশ্মিরী শাল। অধ্যাপক ডক্টর কে মহাকৌতুকভরে কৃষ্ণমোহনকে বললেন, "ওর পোষাকে রামধনুর চেয়ে বেশী রঙবাহার ছিল।" এই বেপরোয়া আচরণে অধ্যক্ষ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করবেন মনস্থ করলেন, কিন্তু রেভঃ ব্যানার্জি বোঝালেন, এ ধরণের বর্ণ-বৈষম্যের বার্তা বাইরে জানাজানি হলে তাঁদের ধর্ম প্রচারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এই যুক্তিসঙ্গত উপদেশ অনুসারে মধুসূদনের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে, বর্ণনির্বিশেষে সকলকেই কলেজী পোষাক ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হল।

আর একদিনের কথা। সেদিন ডিনারের শেষে বরাদ্দ এক গ্লাস সুরা শুধু ইংরাজ ছাত্রদের পরিবেশন করা হল, এ-দেশীয়েরা বাদ পড়লেন। কারণস্বরূপ বলা হল সেদিন ভাণ্ডারে পর্যাপ্ত পরিমাণ

সুরা না থাকাতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে মধুসূদন পানপাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করে তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে উঠে চলে গেলেন। কুনীতির কাছে নতি স্বীকার মধুসূদন জীবনে কখনও করেননি।

এ ধরণের আরও গল্প আছে, শুনতেও ভাল লাগে। একদিন গির্জায় ভারতীয় খৃষ্টানদের উদ্দেশে ইংরাজ পুরোহিত তাঁর অপূর্ব বিকৃত বাংলা বুলিতে ধর্মকথা শোনাচ্ছিলেন। মধুসূদন শুনে গির্জার পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। অনুষ্ঠানের পরে তাঁর আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হল; সোজা উত্তর দিলেন, "হাস্যকর কিছু দেখলে কি শুনলে হাসাই মানুষের ধর্ম।" বহুকাল পরে একদিন জাষ্টিস্ নরিস্ তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "আদালতের কান আছে।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, "বেশ দীর্ঘকর্ণ ই তো মনে হচ্ছে।" সত্য কথা বলতে কোনও প্রকার ভয় বা সঙ্কোচ তাঁর ছিল না।

এইভাবে মধুসূদন বিশপ্স্ কলেজে দুই বৎসর অতিবাহিত করলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য-আকাশে আবার বিপর্যয়ের ঘনঘটা আসন্ন হয়ে এল। এখন ইংলণ্ড যাবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ দূরে অপসারিত হয়েছে; মিশনারীরা সম্পূর্ণ উদাসীন; পিতারও আর উৎসাহ নেই। কিন্তু এই আশাভঙ্গ তাঁকে বিরক্ত করলেও বিচলিত করেনি। ঠিক এই সময়ে রাজনারায়ণ এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যা মধুসূদনের পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। ১৮৪৭ সালের মাঝামাঝি তিনি গৌরকে লিখছেন, "তোমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পর আমি নানা প্রকার বিপত্তির মাঝে অর্ধমৃত অবস্থায় বাস করছি।" কি বিপত্তি তার উল্লেখ মাত্র নেই। কিন্তু বিশপ্স্ কলেজ থেকে গৌরকে লিখিত এইটিই তাঁর শেষ চিঠি। মধুসূদন জীবনে অনেক প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কিন্তু এক অর্থাভাব ব্যতীত তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর কাছেও তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তের পূর্বে কখনও কোনও প্রকার

অনুযোগ-অভিযোগ করেননি। তাঁর আচরণের বায়রণীয় ভঙ্গী সম্পূর্ণ বহিরঙ্গের ব্যাপার; অন্তরে তিনি নির্বাক, নিঃসঙ্গ, একান্তভাবে আত্মনিবিষ্ট। আজও সঙ্কটক্ষণে তিনি নিশ্চুপ। কোনও কারণে তাঁর কর্মব্যস্ততায় বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই; গৌরদাসের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করবার সময় নেই; চিঠির ভাষায় আর সেই প্রাণখোলা প্রগলভতাও নেই; কেমন একটা থমথমে ভাব। এই মানসিক অবস্থার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যের অভাব সত্ত্বেও অনুমান করা দুরূহ নয়।

রাজনারায়ণ বংশলোপের দুশ্চিন্তায় ক্রমশঃ অধীর হয়ে পড়ছেন। মধুসূদনের শিক্ষাব্যবস্থার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করবার পর দু'এক বৎসর নিরস্ত ছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন মধুসূদন সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হওয়াতে জাহ্নবী দেবী প্রসন্ন মনে তাঁর পুনর্বিবাহের সঙ্কল্পকে অনুমোদন করবেন। কিন্তু তা হল না। পুত্রগতপ্রাণ জননী যাতে পুত্রের হানি সম্ভব এমন কোনও ব্যবস্থায় কি ক'রে মত দিতে পারেন? তাঁর নিজেরও আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট তীব্র ছিল। অতএব রাজনারায়ণ প্রথমা স্ত্রীর আপত্তি জেনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ গোপনে সম্পন্ন করবেন মনস্থ করলেন। মধুসূদনের চিঠি থেকে অনুমান হয় ১৮৪৭ সালের মাঝামাঝি তিনি সাগরদাঁড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের অব্যবহিত পরে তিনি জাহ্নবী দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর মানসিক অবস্থা বেশ বোঝা যায়। তিনি লিখছেন: "আমি যে কুকার্য করিয়াছি তাহা তুমি শুনিয়াছ। যদি ইহাতে আমার উপর তুমি অসন্তুষ্ট হও আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।" 'কুকার্য' জেনেও এক ভ্রান্ত কর্তব্যবোধ থেকে তিনি এই গর্হিত কাজ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জাহ্নবী দেবী তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি এক সঙ্গিনীকে বলেছিলেন, "আমার এই জীবন্ত পুত্রশোকের উপর তিনি আমাকে যে মনস্তাপ দিলেন, আমাকে যে অপমান করলেন, তাতে আর কি বলব,

আমি যদি সতী হই, আমা হতে যে সন্তানের মুখ দেখেছেন তাই যেন শেষ হয়।"

নবযুগের আদর্শবিরুদ্ধ রাজনারায়ণের এই নিন্দনীয় আচরণ ও জননীর মর্মান্তিক অপমানবোধ মধুসূদনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। হিন্দু সমাজে নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে তাঁর মত তিনি বহুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছিলেন: লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষে—বলা যায় সারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে—নারীকে পুরুষের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা নারী-জাতির যাবতীয় দুঃখ কষ্টের কারণ।" জননার জীবদ্দশায় পিতার পুনর্বিবাহ মধুসূদনের রুচি ও আদর্শের মূলে আঘাত করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত ঠিকই লিখেছেন, "যুবক মধুসূদন নিশ্চয় সখেদে লক্ষ্য করেছিলেন সেই পারিবারিক ব্যবস্থা যার আওতায় তাঁর মাকে সপত্নীদের সহিত স্বামীর ভালবাসায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল।" নানাপ্রসঙ্গে আমরা মধুসূদনের এ যাবৎ যে চারিত্রিক অভিব্যক্তি দেখেছি, তাতে তাঁর পক্ষে এই ব্যবস্থাকে নীরব দর্শক হিসাবে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। অপমানিত জননীর ম্রিয়মাণ মুখ, অবহেলিত বিমাতার ভাগ্যবিড়ম্বিত ভবিষ্যৎ তাঁর মানবিক চিত্তকে ক্ষোভে ঘৃণায় বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলেছিল। পুত্রের আচরণের জন্যই রাজনারায়ণ এ কাজ করেছিলেন—ক্রুদ্ধ পুত্রের প্রতিবাদের উত্তরে এই ছিল তাঁর মোক্ষম প্রত্যুত্তর। কিন্তু এজাতীয় কৈফিয়ৎ মধুসূদনের ঘৃণাই উদ্রেক করতে পারে। বাদানুবাদ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিল যে দুর্বিনীত পুত্রের আচরণ সহ্য করা পিতার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি পুত্রের মাসহারা বন্ধ ক'রে দিলেন। হয়-ত ভেবেছিলেন পুত্র অভাবের তাড়নায় পুনরায় তাঁর দ্বারস্থ হবেন। কিন্তু মধুসূদনের একরোখা প্রকৃতি জীবনে কখনও আপোষ করতে শেখেনি।

বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়াশোনা বন্ধ হল; তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি জীবিকার্জনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও চিন্তা কখনও করেছিলেন বলে মনে হয় না। এখন অনন্যোপায় হয়ে এ বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা অনিবার্য হয়ে পড়ল। কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে তাঁর খ্যাতির অভাব ছিল না; সমসাময়িক যুব-আন্দোলনের প্রতিপত্তিমান নেতাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁদের কাছে তাঁর অবস্থা জানালেন না। সম্ভবতঃ এ নিয়ে বেশী জানা-জানি হয় এ তিনি কামনা করেননি। অথবা বাঙ্গালীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনাকে তিনি অপমান মনে করতেন: এ জাতীয় দুর্বলতা তাঁর চরিত্রে শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তিনি একবার মাত্র বাংলা সরকারের প্রধান কর্মসচিব হ্যালিডের কাছে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রার্থনা করেছিলেন। এ জাতীয় পদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে তিনি নিশ্চয় অনুপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বিশপ্‌স্‌ কলেজের আচরণ হয়-ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথবা সরকারী লাল-ফিতার দীর্ঘসূত্রিতার সঙ্গে পাল্লা দিবার মত ধৈর্য বা সময় তাঁর ছিল না। কোনও মতে কলকাতার অশুচি আবহাওয়া থেকে পালাতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন।

ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে কলেজ থেকে কয়েকজন মাদ্রাজী যুবক দেশে প্রত্যাবর্তন করছিল। মধুসূদন তাঁদের সঙ্গ নিলেন। তাঁর সামান্য যা কিছু নিজের বলতে ছিল তা বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করলেন, এবং সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে মাদ্রাজ অভিমুখে সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। প্রিয়তম বন্ধু গৌর বসাকও তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

মাদ্রাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা

১৮৪৮ সালের গোড়ার দিকে কোন একদিন মাইকেল মধুসূদন দত্ত কয়েকজন খৃষ্টান বন্ধুর সঙ্গে মাদ্রাজ বন্দরে অবতরণ করলেন। যিনি ছিলেন একদিন 'আলালের ঘরে দুলাল', বিত্তশালী পরিবারের বংশগৌরবের উত্তরাধিকারী, অবস্থাপন্ন পিতামাতার পরম স্নেহধন্য একমাত্র সন্তান, আজ তিনি বিদেশে নিরাশ্রয়, অপরিচিতের সহায়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অবশ্য তাঁর ভাগ্যের এই বিড়ম্বনার জন্য একমাত্র দায়ী তাঁর সৃষ্টিছাড়া আত্মসচেতন ব্যক্তিত্ব।

মধুসূদনের প্রকৃতি এমনই ছিল যে, জীবনে যাকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, জীবনের লক্ষ্য বলে বেছে নিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে বিচ্যুত বা বিচলিত করা অসম্ভব ছিল। আদর্শের প্রতি এই অসামান্য নিষ্ঠাই অনেক সময়ে তাঁর বাস্তবজীবনে অনিষ্টের সৃষ্টি করেছে। নূতন দেশে অজানা পরিবেশে নানা অভাবের সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতা যুক্ত হল। মাদ্রাজে আসবার অল্পকালের মধ্যে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। অবশ্য মাদ্রাজী বন্ধুদের নিঃস্বার্থ সেবা ও সাহায্যে তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছিলেন। অনুমান হয় এই সময় থেকে তিনি (বার্ণাড শ-র মত) তাঁর সুপরিচিত গালপাট্টা রাখতে সুরু করলেন। এতে বসন্তের ক্ষতচিহ্ন ঢাকা পড়ল; সাহেবিয়ানাও পাকাপোক্ত হল: তখনকার দিনে এইটাই ছিল ইংরাজদের ফ্যাশান। কিন্তু বাস্তব জগতে এই প্রকার বিপর্যয় অথবা অভীপ্সার দুষ্প্রাপ্যতা অথবা,—এ জাতীয় কোন বিঘ্নই তাঁকে নিরুদ্যম বা নৈরাশ্যবাদী করে নি। প্রতিকূল অবস্থার বিরোধিতার ফলে তাঁর আশা মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। আদর্শকে অনুসরণ করতে গিয়ে হয়রাণ হয়েছেন অথচ হদিস্ পান নি। তা সত্ত্বেও অসাধ্যসাধনের অধ্যবসায় থেকে তিনি কখনও

নিরস্ত হন নি। যাঁরা এইপ্রকার তেজোদৃপ্ত সক্রিয় মননশীলতার অধিকারী, তাঁরা বিঘ্নকে অতিক্রম করে আপনার পথ আপনি আবিষ্কার করতে পারেন। একেই বলে প্রতিভা,—মধুসূদন এই প্রতিভারই বরপুত্র। তাই এত বিপদের মধ্যেও তিনি আস্থা হারালেন না; ধাপে ধাপে সংশয়হীন পদক্ষেপে নির্বাচিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এ ধরণের বীর্যবান আত্মবিশ্বাস আজও আমাদের কাছে একটা চিরন্তন বিস্ময়।

বিদেশে সর্বপ্রথম প্রয়োজন নিজের পরিচয় দিয়ে সমাজের স্বীকৃতি লাভ। মধুসূদন মাদ্রাজে 'ব্ল্যাক-টাউন' (পরবর্তী কালের জর্জ-টাউন) নামে সহরতলী থেকে মাইল খানেক দূরে অবস্থিত রয়াপুরম্ পল্লীতে একটি আস্তানা জোগাড় করে নিলেন। এটি প্রধানতঃ খৃষ্টান পল্লী; এখন খৃষ্টানেরাই তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। এরপর প্রয়োজন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আত্মপরিচয় দান। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেকে জাহির করলেন; বক্তৃতার বিষয়: "কে এল আমাদের মধ্যে এই অপরিচিত বিদেশী?" এ যেন জেরেমায়া-র প্রশ্নের প্রতিধ্বনি—"কে তুমি এসেছ—হেথা অপরিচিতের মাঝে?" কোনও ব্যক্তির কাছে নয়, একটি সমাজের নিকট তাঁর এই অভিনব পরিচয়পত্র পেশ করলেন; ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নয়, প্রতিভার দাবী নিয়ে বিদেশীর দ্বারে হাজির হলেন। সারাজীবনে বোধ হয় মধুসূদন এই একবারই বক্তৃতা দিয়েছিলেন; কারণ এ জাতীয় প্রয়োজন তাঁর জীবনে এই একবারই উপস্থিত হয়েছিল। অহঙ্কারে তাঁর অরুচি ছিল না, কিন্তু অকারণে তিনি কখনও আত্মপ্রচার করেন নি।

মনে হয় তাঁর এই অভূতপূর্ব আবেদন শীঘ্রই ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইংরাজিতে তাঁর অনবদ্য বাচন-ভঙ্গী ও ভাষার উপর অসামান্য দখল তাঁকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত করল। স্কুলটির নাম "সিভিল অর্ফ্যান য়্যাসাইলাম";

'পপ্‌হ্যাম্ ব্রড্‌ওয়ে'-র গির্জার তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হত। মধুসূদন গৌরের নিকট রসিকতা করে নিজেকে 'আশার্' (অনেকটা আমাদের পাঠশালার পড়ুয়া পণ্ডিতের মতন) বলে অভিহিত করলেন; হয়-ত এর মধ্যে ডক্টর জন্‌সন্‌ও সামান্য 'আশার্' ছিলেন, এ বোধও মনের নিভৃতকোণায় উপস্থিত ছিল। কার্লাইল্ জন্‌সন্‌-কে লেখকের মধ্যে বীর বলে অভিনন্দিত করেছেন: এই বীর্য কি মধুসূদনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না? মর্যাদায় বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষকতা হয়ত কিছুই নয়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাকে বশীভূত করবার প্রয়াসে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে এর মূল্য অনেক। রুজি-রোজগারের নড়্‌বড়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে তিনি কোনও মতে একটু পা রাখবার মত জায়গা করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৌরকে লিখলেন: "আমি এইবার চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখবার একটু সুযোগ পেয়েছি, ভীষণ ঝড়ঝাপটার পরে নৌকার মাঝি যেমন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নঙ্গর ফেলে চারদিক দেখে।"

এইভাবে জীবিকার্জনের একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা করে নিয়ে মধুসূদন এইবার প্রতিষ্ঠা অর্জনের দিকে অগ্রসর হলেন। একদিন কতকগুলি স্বরচিত ইংরাজি কবিতা নিয়ে তিনি তদানীন্তনকালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা "ম্যাড্রাস্ সারকুলেটর"-এর সম্পাদকের নিকট হাজির হলেন। সেকালে মাদ্রাজকে তমসাচ্ছন্ন (benighted) সহর বলা হত। এখানে হিন্দুরা প্রাচীন পন্থার অন্ধ অনুবর্তক; খৃষ্টানেরা ইংরাজের মুখাপেক্ষী। নূতন আদর্শের সংঘাত এখানকার বদ্ধজলায় কোনও আন্দোলন সৃষ্টি করে নি। এদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশে কলকাতার নবজাগরণের চমক-লাগানো দীপ্তি ছিল না, বহুমুখী চিন্তাধারা বা কর্মচাঞ্চল্যও ছিল না। তখন কাশীপ্রসাদ ঘোষ ছাড়া পঞ্চ-দত্তের কণ্ঠনিঃসৃত বিদেশী কাব্যকলার কলগুঞ্জনের অনুরণনে কলকাতার সাহিত্যকুঞ্জ মুখরিত। সেখানে মধুসূদন ছিলেন অজ্ঞ

পাঁচজনের মধ্যে একজন। মাদ্রাজে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইংরাজি ভাষায় একজন ভারতীয় কবির আবির্ভাবের অভিনবত্ব সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। অতএব তাঁর কবিতা 'সারকুলেটর'-এর 'পোয়েট্‌স্‌-কর্ণার্'-এ সমাদরে গৃহীত হল। তিনি একটি ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। কে জানে হয়-ত সে-যুগের পুরোহিত-শাসিত বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা কাব্যচর্চাকে শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্যের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। কিন্তু 'টিমথি পেন্‌পোয়েম্'ই যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ তথ্য বোধ হয় বেশী দিন লোকের অজানা ছিল না। কারণ শীঘ্রই তিনি মাদ্রাজের সুধীসমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

মধুসূদন বেশী দিন 'আশার্'-এর অখ্যাতি ভোগ করেন নি। তাঁকে শীঘ্রই উচ্চ শ্রেণীতে পড়াবার অধিকার দেওয়া হল। একে নিয়তিই বলি, আর ঘটনার হের-ফেরই বলি, মধুসূদনের জীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ে রিচার্ড নেলার নামে একজন শিক্ষক ছিলেন; মধুসূদনের কবি-প্রতিভা এঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সম্ভবতঃ এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে মধুসূদন ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। অন্য অনেকের সঙ্গে ম্যাক্‌টাভিস্‌ নামে একটি স্কটিশ্‌ পরিবারের সহিত তাঁর বিশেষ জানাশোনা হয়েছিল। এই পরিবারের কন্যা রেবেকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের বিভাগে তাঁর ছাত্রী ছিলেন। শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন 'অথেলো'র কৃষ্ণকায় দেহের অন্তরালে তাঁর অসামান্য মন কিভাবে 'ডেসডিমোনা'কে আবিষ্ট করেছিল। মনের প্রতি মনের আকর্ষণ জাতি-বর্ণের বৈষম্য বা ব্যবধান স্বীকার করে না। রেবেকার পিতামহ ডুগাল্‌ড্‌ কুডাপ্পা জেলায় নীল ব্যবসায়ী আরবাথ্‌নট্ কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন পিতাও অবস্থাপন্ন নীলকর ছিলেন। রেবেকার নিজেরও সঙ্গতি ছিল বলে উল্লেখ আছে। অর্থ ও সামাজিক মর্যাদায় নিজের সমাজের যে-কোনও

কৃতবিদ্য যুবক তাঁর সঙ্গে বিবাহ হলে নিজেকে দস্তুরমত সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। কিন্তু 'ডেসডিমোনা'র মতন তিনি মধুসূদনের প্রতিভায় সম্মোহিত হয়েছিলেন: এই মুগ্ধ ভাবই ত পূর্বরাগেরই সূচনা—যেমন বৈষ্ণব কাব্যে, তেমনি বাস্তব জীবনে। আমরা মধুসূদনকে জানি;—কিভাবে তাঁর বন্ধুরা তাঁর প্রতিভার বশবর্তী হতেন তার পরিচয় পেয়েছি। কল্পনা করতে পারি রেবেকা ক্লাসে মধুসূদনের আবৃত্তি শুনতেন; কবি-কল্পনার অপরূপ ভাববিস্তারের মাধুর্য উপভোগ করতেন; কথার ইন্দ্রজাল ও কণ্ঠস্বরের সম্মোহন তাঁকে নিয়ে যেত সেই মানসলোকের নিভৃত নিরালায় যেখানে তরুণ হৃদয়ের মিলন-সঙ্কেত অস্পষ্ট অনুভবের স্পর্শে সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। লক্ষ্য কবি মধুসূদনের এই সময়ের রচিত কবিতার জীবনোপলব্ধি পূর্বের চেয়ে গাঢ়, গভীর ও রোমাণ্টিক আবেগে অনুপ্রাণিত: বিশেষ করে সেই কবিতাগুলি যা কোনও এক অজ্ঞাতনামা রমণীর উদ্দেশে রচিত। এই রমণীর ললিতকণ্ঠের স্বরমূর্চ্ছনা, ঝরে পড়া পুষ্প-স্তবক উপহার, আশার বর্তিকা হাতে বিলসিত আগমন, কবির চিত্তে যে ভাব সঞ্চার করেছিল, তারই আবেগ কবিতাগুলির মূল অনুপ্রেরণা। শিল্পকলার বিচারে এই কবিতায় দুটি নূতন প্রভাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করি। তিনি কাব্যের রূপসজ্জায় কীট্‌সীয় রীতি এই প্রথম অনুসরণ করলেন। স্কট্‌এর কথা-শিল্প কিম্বা বায়রণ্-এর আবেগোচ্ছ্বাস যে বর্জন করেছেন তা নয়; কিন্তু কীট্‌স্-এর মত ইংরাজি ভাষার রীতিবিরুদ্ধ সমাস নিষ্পাদন করে, অথবা নামবাচক শব্দকে প্রয়োজনানুসারে ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন ত করেছেনই; তার উপর কবিতাগুলির গাঢ় ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক মায়া ব্যঞ্জনা কীট্‌স্-এর কবিতার সহিত ঘনিষ্ঠ তাঁর পরিচয় প্রমাণ করে। এ পরিচয়ের প্রভাব তাঁর পরবর্তী কালের বাংলা কাব্যে আরও স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই একবারই মধুসূদনের কাব্যপ্রকাশে খৃষ্টধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব

আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মহিলার সঙ্গীত শ্রবণে তাঁর মনে হল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎসারিত মাধুর্য যেন জগৎ-মাতার স্মিতহাস্যে উদ্‌ভাসিত :

The fair Mother of mankind
Smiled as the moon above her shined.

—জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আভায় যেন লাবণ্যময়ী বিশ্বজননী হাসলেন।

রসেটি-র বহুপূর্বে বঙ্গ-কবির এই অনুভূতি সত্যই বিস্ময়কর। আর একটি কবিতায় বলছেন তিনি পার্থিব জগতের খ্যাতি-গৌরব কামনা করেন না :

But breathe of Him, the Saviour-friend,
The day-spring, Judas' star.

—তাঁর কথা কানে কানে বল যিনি পরিত্রাতা বন্ধু, দিবসের উৎস, (পরম পাপী) জুডাসেরও ধ্রুবতারা।

কে এই মহিলা যাঁর প্রভাবে তাঁর মনে এই ধর্মানুরাগ ক্ষণেকের তরে দেখা দিয়েছে ? সে কি রেবেকা যাঁর প্রীতি আকর্ষণের প্রয়োজনে তাঁর এই আত্মনিবেদন ? না এই ধরণের উক্তিকে আমরা নৈর্ব্যক্তিক কবি-মানসের অহেতুক ভাববিলাস বলে গ্রহণ করব ? এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে প্রমাণের অভাবে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, যে-কাব্য ভাবপ্রকাশের মধ্যে সুসংহত, তা সত্যকার অভিজ্ঞতা-প্রসূত না হয়ে পারে না, কারণ উপলব্ধ ভাবই সুসঙ্কলিত শব্দসম্ভারে ও সহজাত শব্দবন্ধনে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ। মধুসূদনের কিশোর বয়সের কবিতায় ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর প্রশংসনীয় অধিকার সপ্রমাণ করলেও, তাতে উপলব্ধির যথেষ্ট অভাব ছিল। কিন্তু এই কবিতাগুলির ভাবোৎকর্ষ পরিণত জীবনানুগতির পরিচায়ক। এই কারণে মনে হয় এদের উদ্দেশিকা কবির কল্পবিলাসিনী নয়, তিনি তাঁর পরিচিত জগতের কোনও অতি-পরিচিত নারী। রেবেকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা অনিবার্য।

অনতিকালে কাব্যলোকের আবছায়া গোধূলিতে যে প্রেমের প্রথম অস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়, বাস্তবজীবনে তার আত্মপ্রকাশ সহসা সর্বত্র চমক ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। একদিন মধুসূদন ম্যাক্‌টাভিস্ সাহেবের নিকটে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী হলেন। সে যুগে এ ধরণের প্রস্তাব অকল্পনীয় ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তখনকার কালের ইংরাজ পুঙ্গবেরা রুচি ও শালীনতাবোধ অনুযায়ী ভারতীয় নারীকে কখনও পত্নী কখনও উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করতেন, কিন্তু তা বলে কোনও শ্বেতরমণী কি একজন সামান্য কালা-আদমীর অঙ্কশায়ীনী হবে ? 'নেভার, নেভার'—

নেভার সে অপমান হতমান বিবিজান.
নেটিবের কাছে যাবে আমাদের জানানা !
দেহে প্রাণ বিবিজান কখনও তা হবে না।

ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শঙ্খ-ঝঙ্কারে আমরা যেন শুনতে পাই ইংরাজ-সমাজের ক্রোধ-ঝঙ্কার এই অভাবনীয় পরিণয়-সম্ভাবনায়।

রেবেকার আত্মীয়-স্বজনের ঘোরতর বিরোধিতা অন্য কোনও সাধারণ যুবককে হয়-ত নিরস্ত করত। কিন্তু মধুসূদনের প্রকৃতি অন্য ধাতুতে গড়া। বাল্যকাল থেকে ইংরাজ-রমণীকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প তিনি মনের মধ্যে পোষণ করেছেন। এখন দেখা গেল আবার সেই ধর্মান্তর গ্রহণের পূর্বেকার মনোভাব: "সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে কিন্তু আমার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হব না।" রেবেকা আমাদের নিকট কবির পরিত্যক্তা স্ত্রী বলেই পরিচিত। কিন্তু এই ঘটনাটি থেকে মনে হয় তিনিও কম জেদী ছিলেন না। এই সামান্য বালিকার অনমনীয় নির্ভীক অভিযাত্রিক মন আমাদের অবাক করে। পিতামাতার তর্জন, আত্মীয়দের আপত্তি, সমাজের ধিক্কার সব কিছুকে অগ্রাহ্য করবার মতন মনোবল তাঁর ছিল। ব্যক্তিত্বে দুজনই সমান। এ যেন যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন। এঁদের মিলিত সঙ্কল্পের সম্মুখে সমস্ত বিরোধিতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। মাদ্রাজের ইংরাজ-সমাজের নেতৃস্থানীয় য়্যাড্‌ভোকেট্-

জেনারেল স্বয়ং নর্টন্ সাহেব এঁদের সহায়ক হলেন। জর্জ্ নর্টন্ এই প্রতিভাবান বঙ্গযুবকের গুণে মুগ্ধ। তিনি স্বয়ং অগ্রণী হয়ে এঁদের বিবাহের পথে বাধাবিঘ্ন দূর করলেন। মধুসূদন রেবেকাকে বিবাহ করে তাঁর সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার পাতলেন। এ ঘটনা তাঁর মাদ্রাজ আগমনের কয়েক মাসের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল।

এ বিবাহ কতদিন সুখের হয়েছিল আজ তা জানবার উপায় নেই। প্রথম দুই বৎসরের পত্রাবলী থেকে অনুমান হয় সাংসারিক অভাব-অনটন সত্ত্বেও তাঁর মনের আনন্দ অব্যাহত ছিল। গৌরদাসকে লিখিত পত্রে দাম্পত্য জীবনের উল্লেখ পরিতৃপ্তির পরিচয় বহন করে। গৃহিণীর ও চাকরীর খাতিরে নিজেকে একটি 'চলনসই ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি'তে পরিণত করতে হয়েছে বলে রসিকতা করবার মতন মনের সরসতা এর প্রমাণ। "মিসেস্-ডি"-র উল্লেখ সংক্ষিপ্ত হলেও দাম্পত্য-প্রীতির স্পর্শে স্নিগ্ধ: "আমি বাড়ী গিয়ে মিসেস্-ডি-কে তোমার কথা বলব। সে শুনে খুসী হবে। ভারি চমৎকার মেয়ে।" "আমি তোমাকে 'বেহায়া বিধর্মী' বলেছি বলে আমার স্ত্রী রাগ করছে। সে ত আমাদের সম্পর্ক জানে না।" তাঁর প্রথম কাব্য-পুস্তক রেবেকাকে নিবেদন করলেন সুললিত ছন্দে, যা স্পেন্সার্ অথবা কীটস্-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গভীর প্রণয়ের আভাসে তাঁর সমস্ত দুঃখ-দৈন্য জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল।

The heart which once has sigh'd in solitude,
    And yearn'd t' unlock the fount where softly be
Its gentlest feeling,—well may shun the mood
    Of grief—so cold!—when thou, dear one, art nigh
To Sun it with thy smiles,—Love's lustrous radiancy!

[যে-হৃদয় একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বিজনে
    ব্যাকুলিছে মুক্তি দিতে ফল্গুধারা যেথায় শায়িত চুপে
কোমল আবেগগুলি—সেই শুধু সহজে সে ভাব মোচনে
    বেদনার-হিমশীতল,—যবে তুমি, হে প্রিয়, আসিবে সমীপে
আলোকিবে তোমার হাসিতে, দ্যুতিময় প্রেমের প্রদীপ।

—[গৌরাঙ্গ পণ্ডিত কৃত অনুবাদ]

বিবাহ করলেন, সংসারী হলেন, অদৃষ্ট-চক্রে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ; হয়ত' হরে-দরে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী: কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মধুসূদনের কাব্যসাধনায় ছেদ পড়ে নি। 'ম্যাড্রাস সারকুলেটর' পত্রিকার 'পোয়েট্‌স্‌ কর্ণার'-এ 'টিমথি পেন্‌-পোয়েম্‌' ছদ্ম নামে 'ডিসজেক্‌টা মেম্‌ব্রা' শিরোনামায় তাঁর কবিতাগুলি নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল, প্রশংসারও অভাব ছিল না। এগুলি কবিমানসের 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্ন' প্রকাশ—ল্যাটিন শিরোনামাটির এই ছিল হরেশীয় তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। পরে দুইটি বৃহত্তর কবিতা প্রকাশিত হল: 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি' ও 'এ ভিশ্যান্‌'। পত্রিকার জনৈক পাঠক দ্বিতীয় কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। 'তমসাচ্ছন্ন' মাদ্রাজের কোনও অধিবাসী যে এ কবিতা রচনা করেন নি, এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়: মধুসূদনের আবির্ভাব মাদ্রাজে এমনই চমক সৃষ্টি করেছিল। এই সমালোচনা থেকে আমরা একটা কৌতুকবহ তথ্যের সন্ধান পাই। মধুসূদনের কাব্য-খ্যাতি ইতিমধ্যেই স্থানীয় কোনও কোনও মহলে ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল। সমালোচক কবিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি একান্তই বাণীর বরপুত্র: অতএব যাঁরা বাগ্‌দেবীর তল্পিবাহক হবারও উপযুক্ত নয়, তাঁদের ধৃষ্টতা যেন তাঁকে নিরুৎসাহ না করে। মাদ্রাজে বিরূপ সমালোচনার ক্ষীণতম আভাস এইভাবে ধিক্কৃত হয়েছিল।

'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি'র প্রশংসাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি আখ্যানমূলক কাব্য, কতকটা স্কটের কাহিনীকাব্যের অনুরূপ, কিছুটা বায়রনীয় ভঙ্গিতে রচিত। সংবাদপত্রে কবিতাটি তাঁর বিদ্যালয়ের সহকর্মী নেলার্‌-এর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু পুস্তিকা আকারে প্রকাশনের সময়ে উৎসর্গ করলেন মাদ্রাজের শিক্ষাসংস্থার সভাপতি জর্জ্‌ নর্টন্‌-এর নামে। এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করে নর্টন্‌ তরুণ কবিকে লিখেছিলেন: "এ রূপ শক্তি ও সম্ভাবনাপূর্ণ কাব্য আমার নামের সহিত জড়িত থাকায় আমি নিজেকে সম্মানিত

মনে করছি।” মনে রাখতে হবে এই ভাষা ব্যবহার করছেন মাদ্রাজের প্রথিতযশা ‘য়্যাডভোকেট জেনারল’ একজন অজ্ঞাতকুলশীল প্রবাসী বাঙালী যুবকের উদ্দেশে। মধুসূদনের এই কাব্যকীর্তি নর্টন্‌-এর মনে এমনই রেখাপাত করেছিল যে, তিনি তাঁকে ডেকে তাঁর পরিচয়াদি মন দিয়া শুনলেন, এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অথবা কোনও জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর সৌজন্য মধুসূদনকে অভিভূত করেছিল, এবং বেশ একটু আত্মপ্রসাদের সুরে তিনি গৌরদাসকে লিখলেন, “আমরা পরস্পরের সহিত বন্ধুর মতন পত্রালাপ করি। বৃদ্ধ তাঁর প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ আমাকে কয়েকখানি মূল্যবান ‘ক্ল্যাসিক্যাল্‌’ বই উপহার দিয়েছেন।”

গৌরদাসকে লিখিত এই সময়ের চিঠিপত্রে মধুসূদন প্রায়ই তাঁর আর্থিক দুরবস্থা ও দুশ্চিন্তার কথা লিখতেন। সম্ভবতঃ এই প্রকার অনুযোগের উত্তরে গৌরদাস একবার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর এই অবস্থা তাঁরই নিজের কৃতকর্মের ফল। হঠকারিতার বশে তিনি যদি মায়ের আশ্রয় পরিত্যাগ না করতেন, তাঁর জীবনে কোন অভাবই থাকত না। এ ধরণের সমালোচনায় মধুসূদন বিশেষ-ভাবে উত্তেজিত হতেন। উত্তরে তিনি লিখলেন, “একটা বিষয়, গৌর, তুমি ভুল করেছ, গুরুতর ভুল,—আমার মায়ের সম্বন্ধে এ জাতীয় উক্তি করে। তোমাকে বলছি এ পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের পথ নিজেকে করে নিতে হবে। তুমি কি মনে করো মানুষ চিরকাল তার মায়ের আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকবে?” কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা করা চিরদিন মধুসূদনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নিজের জীবনে বা অপরের জীবনে কোনও প্রকার দুর্বলতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি।

মধুসূদনের উন্নতি চেষ্টায় এক মুহূর্ত বিরাম নেই। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কাব্য মাদ্রাজের আর একটি বিদগ্ধ ইংরাজের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিল: তিনি হেন্‌রি মীড্—'এথেনিয়াম' ও 'স্পেক্‌টেটর'—এই দুইটি পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক। গভীর পরিতৃপ্তির সহিত মধুসূদন গৌরদাসকে জানালেন, সম্পাদক যে-সে ব্যক্তি নহেন, সারা ভারত জুড়ে তাঁর সম্পাদকীয় খ্যাতি। এ হেন ভদ্রলোক প্রাণপণে তাঁর হয়ে 'ঢাক পিটাচ্ছেন'! 'এথেনিয়াম'-এ 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডি'র একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা বের হয়েছিল। সমালোচক কবিতাটির দোষগুণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, কবিতাটিতে বায়রনীয় নাটুকেপনা যথেষ্ট আছে; অলঙ্কারের বাহুল্যে অনেক সময়ে ভাষা কণ্টকিত; ভাবব্যঞ্জনা অপেক্ষা রচনাশৈলীর প্রতি কবির অনুরাগ বেশী। কিন্তু এই প্রকার দোষ-ত্রুটি ত শেলী-কীট্‌স্-এর রচনায় অপ্রতুল নয়। আসল কথা, এই সব দোষ-ত্রুটি অতিক্রম করে এর কাব্যিক আবেদন মনকে স্পর্শ করে। 'ক্লাসিক' অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মতানুসারে কল্পনা বা ভাবের ঝোঁকে অহেতুক বাক্-বিস্তার নিন্দনীয় হলেও, অধুনা কালের বিচারে রুচিসম্পন্ন রসিক মনের পরিপোষণে এর সার্থকতা স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি নির্ভর করে কবির অনুভবের গভীরতা ও কল্পনার প্রসারের উপর। সমালোচকের মতে মধুসূদনের কবিতায় এই সব সদ্‌গুণ আছে বলেই তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয়। পড়লেই বোঝা যায়, এ সমালোচনা একজন রসজ্ঞ ব্যক্তির।

এইভাবে মধুসূদনের খ্যাতি এক বৎসর যেতে না যেতে মাদ্রাজের শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। হেনরী মীড্ সেকালে মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। বাস্তবিক সে যুগে মাদ্রাজের নাগরিক জীবনে নর্টন্ ও মীড্ যুগ্ম-স্তম্ভ ছিলেন। নর্টন্ শিক্ষা বিভাগে মধুসূদনের উন্নতির পথ সুগম করে দিতে প্রতিশ্রুত। এখন মীড্ তাঁকে সাংবাদিকতায় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। মধুসূদন অল্পদিনের মধ্যে 'এথেনিয়াম্' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। অনেক

সময়ে মীড্ নিজের অনুপস্থিতিতে মধুসূদনের উপর সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। একজন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের পক্ষে এইরূপ সম্মানলাভ বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। এবং এ সম্মান তিনি আদায় করেছিলেন স্বীয় প্রতিভার বলে; কোন মুরুব্বীর পৃষ্ঠপোষকতায় নয়।

মোটের উপর বলা যায়, প্রবাসের প্রথম বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই মধুসূদন অভাবনীয় খ্যাতি ও প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক দুশ্চিন্তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি, এবং বন্ধুকে লিখিত চিঠিপত্রে তার উল্লেখ প্রায়ই থাকত। এই সব অনুযোগের মধ্যে কতটা বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন আর কতটা রোম্যান্টিক কল্পনার নাটকীয়তা, তথ্যের অভাবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডি'র ভূমিকায় তিনি আর্থিক অভাবের উল্লেখ করেছেন, এবং তা নিয়ে 'বেঙ্গল হরকরা' অশোভন ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করতে কসুর করে নি,—একদিন যেমন কীট্‌স্-এর কৌলীন্যের অভাব নিয়ে লক্‌হার্ট উপহাস করেছিলেন। কবিতাটির প্রারম্ভে রেবেকার উদ্দেশে যে প্রশস্তি আছে, তার বিষয়বস্তু—সুদূর প্রবাসে দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত জীবনের একাকীত্ব নিয়ে আত্মরতি, যা রোম্যান্টিকতার একটি মৌলিক লক্ষণ; 'নিজেকে কুৎসিৎ বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে' কল্পজগতে আনন্দ বিহারের এষণা প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। এখানে রেবেকা ঘরের ঘরণী নয়, কল্পলোকের মানস-সুন্দরী, যার দিব্য প্রভাব তাঁর জীবনের আঁধারকে আলোকিত করে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে মানসসুন্দরীর যাদুশক্তির গুণকীর্তনের প্রয়োজনেই পরিবেশকে নিকৃষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ, কাব্যের অঙ্গ-সজ্জায় যা প্রয়োজন, তা জীবনের আসল পরিচয় না-ও হতে পারে। মধুসূদন রোম্যান্টিক কাব্যের সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই তাঁর ইংরাজি কবিতায় ব্যবহার করেছেন; তাই যখন দেখা যায় এ ধরণের আত্মবিলাপ তাঁর বাংলা কাব্যে মোটের উপর অনুপস্থিত,

তখন মনে হয়, এর উৎস জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ততটা নয়, যতটা বায়রনীয় ভঙ্গীর অনুকরণ।

এ সম্বন্ধে দুয়েকটি প্রমাণ যে নেই তা নয়। গৌরদাস তাঁর প্রকৃত অবস্থা জানাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু কোনও সদুত্তর পান নি। মধুসূদন তাঁকে পরে জানাবেন বলে এড়িয়ে গেছেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর গৌরদাস মধুসূদনকে ভাগ্য পরীক্ষার্থে তাঁর সঙ্গে লাহোরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করে বিফল হয়েছিলেন। আর একবার লিখলেন, হ্যালিডে তাঁর সম্বন্ধে খবরাখবর করেছেন, এবং তাঁর সহসা কলকাতা ত্যাগে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কলকাতায় এখন তাঁর চাকরী পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এ শুনেও তিনি কলকাতায় আসবার কথা চিন্তাও করেন নি। সত্যকার অভাবের সহিত এ জাতীয় আচরণ কি কিছুটা অসঙ্গত বোলে মনে হয় না? তা ছাড়া চিঠিপত্রে অভাব-অভিযোগকে অতিক্রম করে ধরা পড়ে অনাবিল আনন্দ ও পরিতৃপ্তির সুর: "ভাগ্য আকাশে আমার জীবনের তারা দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছে"; "তুমি জান, বন্ধু, আমি যখন এখানে এসেছিলাম, আমার কোনও বন্ধু ছিল না; এখন এখানকার অনেক হতভাগ্য আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। ল্যাটিন কবি বলেছেন, যে বীর, অদৃষ্ট তারই সহায়।" এ জাতীয় উক্তি বা মন্তব্য নিশ্চয় তাঁর ললিত ছন্দে বর্ণিত দুঃখ-দুর্দশাকে সপ্রমাণ করে না। প্রকৃতপক্ষে ধীর পদক্ষেপে হলেও, উন্নতির সোপানে তাঁর আরোহণ অব্যাহত ছিল।

অবশ্য অভাববোধ যে আদৌ ছিল না তা নয়। কিন্তু সে নিতান্তই আপেক্ষিক। ব্যক্তি-প্রধান সমাজে অভাবের বৃদ্ধি আছে, শেষ নেই। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাতে সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেবার পর মন বিচলিত হয়ে ওঠে যখন সাধারণ অনটনের উপর এসে পড়ে কোনও উপরি তাগিদ। গৌরদাসকে যখন অভাবের কথা লিখছেন, তখন 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি'র দরুন ছাপাখানার

তাগিদে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কোনও রকমে অর্থ না সংগ্রহ হলে বিদেশে মান থাকে না। কবিতার বই বিক্রয় করে ছাপাখানার দেনা শোধ করার সম্ভাবনা সর্বত্রই সুদূরপরাহত, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘুমন্ত মাদ্রাজে। তাই অনন্যোপায় হয়ে মধুসূদন বন্ধুদের শরণাপন্ন হলেন। গৌরকে বিশেষ করে লিখলেন তাঁর আশু প্রয়োজনের কথা; বিশেষ করে জানালেন সমাজে তাঁর যা প্রতিষ্ঠা তাতে দেনা করা কিছুতেই চলবে না। অনেক দিন পরে ভূদেবকেও এই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন। স্বরূপ, বঙ্কু, আবদুল লতিফ প্রভৃতি বন্ধুদের খোঁজখবর করলেন। সকলে মিলে কয়েকখানা 'ক্যাপ্‌টিভ লেডি' কলকাতার বিদগ্ধ মহলে বিক্রয় করে পুরাতন বন্ধুর সহায়তা কি তাঁরা করবেন না? আবার বিশপস্ কলেজের বন্ধুরা কয়খানি বই বিক্রয় করেছেন তার ফর্দ দিয়েও বন্ধুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পৃহা জাগাতে চেষ্টা করলেন।

তাছাড়া কলকাতার সুধী সমাজের মতামত জানবার লোভও বিলক্ষণ আছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষকেরা তাঁর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কি মনে করেন? ডি. এল. আর. কে নিজেই পাঠিয়েছেন—গুরু দক্ষিণা হিসাবে। রাম মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতিকে বই দিতে অনুরোধ করে গৌরকে লিখেছেন। এঁদের মতের মূল্য মধুসূদনের কাছে সারা মাদ্রাজের সমস্ত সুখ্যাতির ঊর্ধ্বে। সমবেত চেষ্টার ফলে বিক্রয় কিছু যে না হয়েছিল তা নয়; আশানুরূপ না হলেও নৈরাশ্যজনকও বলা যায় না। কিন্তু মতামত?

একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন মত, নূতন পথ

সত্য কথা বলতে কি তমসাচ্ছন্ন মাদ্রাজের তুলনায় কলকাতার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সাড়া অত্যন্ত ক্ষীণ ও কুণ্ঠিত বলে মনে হল। গৌরদাস অবশ্য প্রশংসা করেছেন কিন্তু সে ত আত্মপ্রশংসারই সামিল। ছাত্রজীবনে তাঁর কবিতার প্রথম গুণগ্রাহী শ্রোতা ও উৎসাহদাতা ভোলানাথ অবশ্য খুসী হয়েছেন। কিন্তু আর সকলে নিরুত্তর কেন? ভূদেবের মতামতের উপর নির্ভরতার অন্ত ছিল না, কিন্তু তাঁর মন্তব্য বোধ হয় বিরূপ। না হলে কেনই বা সহসা তাঁকে 'একটা ভণ্ড' (humbug) বলে অভিহিত করলেন? গুরু রিচার্ডসন-ও কি ছাত্রের কৃতিত্বে খুসী হন নি? তাঁর নিরুত্তরের কারণ কি? যখন বন্ধুদের প্রশংসাতে তেমন আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায় না, তখন অ-বন্ধুদের ত কথাই নেই। 'হরকরা' রূঢ় স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করে প্রশ্ন করল, "এত তাড়াহুড়া করে এ কবিতা প্রকাশ করবার কি প্রয়োজন ছিল?...মাইকেল এম. এস. ডাট্-এর এই ছন্দানুলেখ কাব্যনির্বিশের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে হয় ত মন্দ নয়; কিন্তু তাঁর ছন্দরচনার ক্ষমতা যদি তাঁর মনে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে থাকে যে, এর দ্বারা তিনি ধন-মান লাভ করবেন, অথবা এর মহিমায় তিনি সামান্য কলম-পেশা বৃত্তির প্রতি অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করবার অধিকার লাভ করেছেন, সেটা হবে নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।" এই রূঢ় সমালোচনার প্রতি মধুসূদন যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করুন, অন্তরে তিনি একে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ জাতীয় স্পষ্টবাদিতা অশিষ্ট হলেও মর্মসচেতন বিদগ্ধ কবির মনে আত্মসমালোচনা উদ্রিক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। সম অবস্থায়

জন্ কীট্স্ অযথা অনুযোগ না করে, প্রতিভার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এবং সার্থকতা লাভও করেছিলেন।

মধুসূদনের বুঝতে দেরী হয় নি যে, গৌরদাসের প্রশংসাতেও যতটা উচ্ছ্বাস আছে ততটা আন্তরিকতা নেই। প্রথম উন্মাদনার অবসানান্তে তাঁকে লিখলেন, "আমি নিশ্চয় জানি যে, আমার কাব্য তোমাকে নিরাশ করেছে। এটা আমি অনুভব করছি।" বন্ধুর কাছে স্বীকার করলেন, "মনে রেখ, বন্ধু, আমি এই কবিতা প্রকাশ করেছিলাম ভবিষ্যতে উন্নতির আশায়। আমি সুখ্যাতি অপেক্ষা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।" কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হলেও, বাস্তব জীবনে যে-কবিতা তাঁকে বিদেশে খ্যাতি-প্রতিপত্তি, গুণীজনের বন্ধুত্ব, সমাজে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে, তাকে তিনি ব্যর্থ বা নিস্ফল মনে করবেন কেন?

কিন্তু কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের নিকট 'ক্যাপ্টিভ লেডি' যে সমাদর লাভ করে নি, তার জন্য কাব্যের দোষ-ত্রুটিকে একমাত্র দায়ী করলে ভুল হবে। ঠিক এই সময়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলে এক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আভাসিত হয়েছিল যার মূলে ডিরোজিও-র শিষ্যদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ডিরোজিও-র এই সব শিষ্যেরা এখন প্রৌঢ়ত্বের পরিণত বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। গুরুর কাছে তাঁরা ইংরাজি শিখেছিলেন পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারাকে আত্মসাৎ করবার প্রয়োজনে—সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা কৃতিত্ব নিয়ে আস্ফালন করবার জন্য নয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা এযাবৎ নানাবিধ সভা-সমিতি পরিচালনা করে এসেছেন। এক সময়ে তাঁদের মুখপাত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাটি শিক্ষিত মহলে এক বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিল, যা তদানীন্তনকালে অন্য কোনও পত্রিকা করে নি। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও অর্থানুকূল্যে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল, যাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের

জন্য বাংলাভাষাকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করতেন। রাধানাথ শিকদার স্পষ্টই বলতেন, যে ভাষা বাড়ীর মেয়েরা [অর্থাৎ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞেরা] বুঝতে পারে না, সে কি আবার একটা ভাষা!—'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৪০ সালে বন্ধ হল। এর দশ বার বৎসর পরে এই আদর্শকে ব্যাপকতর করবার অভিপ্রায়ে রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন: যাতে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা ভাষা সৃষ্টি করা যা প্রকৃত শিক্ষার বাহন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আর একটি গোষ্ঠী অন্য দিক দিয়ে বাংলা ভাষা ও উন্নত চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এর কেন্দ্রপুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং কর্ণধার ছিলেন দু'জন অনন্যসাধারণ মনীষী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং তার পত্রিকা বাঙালীর চিন্তাধারায় ও সাহিত্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। বস্তুতঃ চিন্তাশীল ও ভাবব্যঞ্জক আলোচনার উপযুক্ত গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোটকথা বাংলা গদ্য রচনার দুই রীতি—কথ্য রীতি (যাকে মধুসূদন একদিন 'মেছুনীর ভাষা' বলে উপহাস করেছিলেন) ও সাহিত্যিক রীতি—শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজনে এই সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল। নূতন ভাবধারা গ্রহণ ও প্রচারের যোগ্য ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের আবশ্যকতা সকলের মনেই গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। ডিরোজিও-র শিষ্যগণ ও ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন প্রধানতঃ তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী ও তরুণ রাজনারায়ণ বসু। এঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হলেও এঁদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল, এবং ঠাকুরবাড়ীর আওতায় পরবর্তী কালে এই বোধ কি ভাবে

পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পাশ্চাত্য ভাবকে মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রহণ ও পরিবেশন করতে হবে এই নূতন দাবীকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করেছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় দশকে ডিরোজিও, তৃতীয় দশকে রিচার্ডসন ও চতুর্থ দশকে বীটন্-এর প্রভাব আমাদের শিক্ষা জগতে যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা প্রণিধানযোগ্য। রিচার্ডসন-এর প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ডিরোজিও-র বলিষ্ঠ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষা চর্চায় তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, যার ফলে অল্পকালের জন্য বাংলাদেশের সাহিত্যকুঞ্জ বিলাতি ছন্দের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল। ডিরোজিও-র ছাত্র প্যারীচাঁদ ও রিচার্ডসন-এর ছাত্র কিশোরীচাঁদ—এই দুজন সহোদর ভ্রাতার সাহিত্যবোধের ভিন্নতা দুই গুরুর প্রভাবের মৌলিক তারতম্য প্রমাণ করে। প্যারীচাঁদ সারা জীবন বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; ইংরাজিতে কৃতবিদ্য হয়েও মাতৃভাষার একনিষ্ঠ চর্চা করেছেন। কিন্তু কিশোরীচাঁদ যা কিছু লিখেছেন প্রায় সবই ইংরাজিতে। ডিরোজিও ছিলেন ভাবের কাণ্ডারী; প্রত্যক্ষভাবে ভাষা নিয়ে মাথা ঘামান নি। রিচার্ডসন ভাষার কারিগর; ইংরাজি শব্দ চয়ন ও গ্রন্থনা নিয়ে তাঁর কারবার। ডিরোজিও স্বাধীনতার পূজারী ও প্রচারক; রিচার্ডসন শাসনের ভঙ্গীতে ধমক দিয়ে বলতেন, "আমি হিন্দুকলেজে রাজদ্রোহীদের আস্তানা হতে দেব না।" একজন মনকে স্বাধীন করেছেন, অন্যজন চিন্তাকে পঙ্গু করতে সহায়তা করেছেন। বীটন্ কতকটা ডিরোজিও-র আদর্শকে পুনরুদ্ধার করার দিকে ঝোঁক দিলেন। বিদেশী হয়েও তিনি এই মূল সত্যটি বুঝেছিলেন যে, মাতৃভাষা ব্যতীত ভাবের কি অনুভবের সার্থক স্ফুরণ সম্ভব নয়। সুযোগ

পেলেই তিনি একথা আমাদের দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রসমীপে তিনি যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজও আমাদের বিবেচনার যোগ্য। তিনি বলেছিলেন: "ইংরাজি ভাষা যে কখনও বাংলার কোটি কোটি সাধারণের অধিগম্য হবে এ আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের কর্তব্য পালন কর, একদিন গ্রীক ও ল্যাটিন ইংলণ্ডে যে কাজ করেছিল, আজ ইংরাজি ভাষা বাংলায় সেই একই কাজ করবে। তোমরা ইংরাজি বিদ্যার সহায়তায় যে ভাবধারা আহরণ করবে, তা ক্রমশঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে সারা বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হবে। আজ বাংলা ভাষার অবস্থা পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ইংরাজি ভাষার যা ছিল সেই প্রকার অমার্জিত ও অপরিশীলিত। তোমাদের রুচি ও বিদ্যাই এ ভাষাকে সংস্কৃত ও অলংকৃত করবে।" কলকাতার ইংরাজির মোহগ্রস্ত বঙ্গযুবকদেরও তিনি এই একই উপদেশ সুযোগ পেলেই দিতেন।

বিভিন্ন দিক থেকে এই সমস্ত প্রভাব সম্মিলিত হবার ফলে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি হয়েছিল, তা মধুসূদনের ইংরাজি কাব্যের সমাদর লাভের অনুকূল ছিল না। তিনি কলকাতা ত্যাগ করবার পর থেকে বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি ও জীবনের আদর্শে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। কবির অলক্ষ্যে তাঁর কাব্যসাধনার পরিবেশ প্রস্তুত হচ্ছিল। 'হরকরা'র সমালোচনা ও বন্ধুদের অনুচ্ছ্বাসের আসল কারণ এই রুচি ও আদর্শের মৌলিক পরিবর্তন।

গৌরদাস মনে মনে বীটন্-এর যুক্তি ও পরামর্শের সারবত্তা অনুভব করেছিলেন। বন্ধুর প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভার প্রকাশ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে হতে

তালিকা এই প্রকার : ৬—৮, হিব্রু; ৮—১২, স্কুল; ২—৫, তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫—৭, ল্যাটিন; ৭—১০, ইংরাজী। আমাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করবার মহৎ কাজে কি আমি নিজেকে যথোচিতভাবে নিযুক্ত করছি না?" মধুসূদনের রসনায় সহসা একদিন বাগদেবীর ভর হয়েছিল বলে তিনি কবি, এ ধারণায় অলৌকিকত্বের আবেদন হয়-ত আছে; কিন্তু আসল কথা এই যে, তিনি আমাদের সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা পরিশীলিত কবি; আমাদের আধুনিক কালের সাহিত্যে বহু সাধনার্জিত বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যে তাঁর সমকক্ষ নেই।

এই সময়ে ১৮৪৯ সালের আগষ্ট মাসে মধুসূদনের প্রথম কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পিতৃত্বের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্ধুকে এই সংবাদ দিয়ে অনুরোধ করলেন, চিঠি পেয়েই খিদীরপুরে পিতাকে যেন সংবাদটি প্রেরণ করেন নিজে লিখলেন না এক অদ্ভুত অজুহাতে: "বাংলায় এ সংবাদ কি ভাবে দিতে হয় তা আমি জানি না।" মনে হয় প্রকৃত কারণ একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ। পিতার প্রতি মন এখনও অপ্রসন্ন, কলকাতা ত্যাগের পর দেড় বৎসর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ বন্ধ। বিদেশিনী পুত্রবধূর কন্যার জন্মবারতা রাজনারায়ণ কিভাবে গ্রহণ করবেন বলা যায় না। জাহ্নবী দেবীকে জানাবার মত মনোবল নেই। সন্তান হয়ে তিনি জননীকে সুখী করতে পারেন নি; তিনি কোন মুখে নিজের সন্তানসুখ জননীকে জানাবেন? জাহ্নবী দেবী অবশ্য সুযোগ পেলেই পুত্রকে 'পার্সেল' পাঠাতেন, কিন্তু তাঁকে দেবার মতন মধুসূদনের আজ কিছুই নেই।

আগষ্ট ১৮৪৯ থেকে জানুয়ারী ১৮৫১ পর্যন্ত মধুসূদন সম্বন্ধে অদ্যাবধি বিশেষ কিছু জানা যায় নি। অভিন্নহৃদয় বন্ধু গৌরদাস ছিলেন বাংলাদেশের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র; কিন্তু তাঁর সঙ্গেও হঠাৎ পত্রালাপ বন্ধ হল। হয়-ত অবিরাম জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে

তাঁর মন ক্লান্ত অবসন্ন। হয়-ত সংসারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও দাবী মিটাবার দায়িত্ব পালনে তাঁর সমস্ত অবকাশ অপহৃত। এ-ও হতে পারে তাঁর অশান্ত মনের দুর্নিবার গতি জীবনে এমনতরো জটিলতা সৃষ্টি করছিল দিনে দিনে, যে তার প্রভাবে ক্রমশ তিনি বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। কিন্তু এ সবই অনুমান।

এইটুকু মাত্র সত্য যে একদিন নটন্ তাঁকে যে উন্নতির আশা দিয়েছিলেন, তা আজও অপূর্ণ, এবং অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা-পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনাও দেখা যায় না। মধুসূদনের অদৃষ্টের কিছুটা প্রকাশিত অনেকটাই অপ্রকাশিত। এই প্রকাশ ও অপ্রকাশের অন্তর্দোলায় কবি-জীবনের রহস্য অবধৃত। কবির জীবন ঊর্মিমুখর সাগরের মতন পতন-অভ্যুত্থানের তরঙ্গদোলায় আন্দোলিত। সুগভীর তার ছন্দহিল্লোল; সুদূর প্রসারিত তার অনুভবের ইসারা। তাই জীবনের বহিপ্রকাশে কখনও তিনি প্রশান্ত প্রসন্নতায় আত্ম-সমাহিত; কখনও দুর্জ্ঞেয় অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ। মধুসূদন প্রাচীন মধ্যযুগীয় সংস্কারকে একদিন জীর্ণ-বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছিলেন; এবং তার পরিবর্তে একটা নূতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ঐকান্তিক আগ্রহভরে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব সংস্কার বর্জন ও অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্বর্তী অশান্ত অনবচ্ছিন্ন পরিবেশের সঙ্গে প্রায়ই এক অস্বস্তিকর অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। তিনি মাদ্রাজে প্রবাসী, ছন্নছাড়া; বিদেশিনীকে বিবাহ করে ঘরেরও না পরেরও না, বন্ধু আছেন অনেক, কিন্তু গৌরের মত অন্তরঙ্গ একজনও নেই। জীবনের এবং মনের এই শূন্যতা পূর্ণ করবে কে? সে ক্ষমতা কি রেবেকার ছিল?

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদনের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। পুত্র-বিরহে কাতর, সন্তানলোলুপ স্বামীর বার বার দারপরিগ্রহে মর্ম-পীড়িত এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত মহিলার জীবনাবসানে তাঁর সব দুঃখের অবসান হল। রাজনারায়ণ সম্ভবতঃ মধুসূদনকে জননীর অন্তিম-

সম্ভাবনার সংবাদ দিয়েছিলেন। যে কোনও সূত্রে হোক, সংবাদ পেয়ে তিনি কলকাতায় অবিলম্বে এসেছিলেন, কিন্তু জননীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় নি। শুধু পিতার সঙ্গে নিঃশব্দে দেখা করে, দু'চার দিন কলকাতায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে, আত্মীয়-বন্ধু কারও সাথে সাক্ষাৎ না করে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নীরবে মাদ্রাজে ফিরে গেলেন।

Deep-hearted men express
Grief for the dead in silence like to death.

মাদ্রাজে ফিরে এসে জীবনের গতি পুনরায় প্রবাহিত হল তার চিরা-চরিত বৈচিত্র্যহীন ধারায়। এখন কলকাতার সঙ্গে সমস্ত স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন; এখন মধুসূদন নিজের সাধনায় ও সমস্যায় আত্মসমাহিত। সহসা এই স্বেচ্ছাবৃত অজ্ঞাতবাসের তিমির আবরণ ভেদ করে বন্ধুর সম্বন্ধে একটি সংবাদ গৌরদাসকে সচকিত করল। 'বেঙ্গল হরকরা'য় একদিন পড়লেন মাদ্রাজের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত 'বাংলার ডাকাত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। পত্রিকাটির নাম 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্‌'; সম্পাদক —মাইকেল এম্. এস্. ডাট্। এই বৎসরই মধুসূদন এই পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রবন্ধটি পড়ে গৌরদাস মধুসূদনকে তাঁর অভিনন্দন জানালেন, এবং সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করে একখানি সংবাদপত্র পাঠাতে লিখলেন (জুলাই ২৯, '৫১)। পত্রের উপসংহারে জানুয়ারী মাসে তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না-করার জন্য ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পত্রে বন্ধুর মাতৃ-বিয়োগের জন্য কোনও সমবেদনা বা সহানুভূতি প্রকাশ নেই। এই অনুল্লেখ কি ইচ্ছাকৃত না অনবধান বশতঃ? মধুসূদন কি মনে করলেন জানি না; তিনি বন্ধুকে নিয়মিতভাবে হিন্দু-ক্রনিক্‌ল্‌ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তাঁর পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না। বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপে তাঁর এযাবৎ অনলস লেখনী আজ সহসা স্তব্ধ।

পত্রিকা সম্পাদনায় মধুসূদনের কৃতিত্ব যে সে-যুগে বিলক্ষণ স্বীকৃতি লাভ করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর প্রবন্ধগুলি অনেক সময়ে কলকাতার কাগজে উদ্ধৃত ও প্রশংসিত হত। 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' বিখ্যাত কোহিনুর হীরক খণ্ড অপহরণ করে যখন ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপহার দিল, তখন একে খণ্ডিত করে রাণীর অলঙ্কারে ব্যবহার করবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মধুসূদন তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় যে প্রতিবাদী প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া'তে তা উদ্ধৃত হয়েছিল। মধুসূদনের ইংরাজি গদ্য রচনায় ভারও ছিল, ধারও ছিল; নতুবা মীড্-এর মত জহুরীর যাচাইয়ে তা উত্তীর্ণ হত না নিশ্চয়। পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁর দক্ষতার অভাব ছিল না। কারণ অল্পদিনের মধ্যেই 'হিন্দু-ক্রনিক্ল্' সাপ্তাহিক থেকে অর্ধসাপ্তাহিকে পরিণত হল। কিন্তু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন কর্তৃক 'হিন্দু-ক্রনিক্ল্' সম্পাদনার গৌরবময় ঐতিহ্যের অবসান ঘটে।

অনুমান হয় তাঁর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে নর্টন্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তা কার্যে পরিণত করলেন। মধুসূদন মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন। স্কুলটি কলকাতার হিন্দু কলেজের অনুরূপ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাজে বেণ্টিঙ্ক-এর প্রস্তাব কার্যকরী করতে বিলম্ব হয়েছিল। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে একটি শিক্ষা-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার সভাপতি জর্জ্ নর্টন্; সম্পাদক উইলিয়াম আরবাথ্‌নট্। পরবৎসর এর অধীনে প্যানথিয়ন রোডে ইউনিভার্সিটি হাইস্কুল নামে বিদ্যালয়টি প্রবর্তিত হল। এখানে হিন্দু কলেজের মতন উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষক ইংরাজ। যখন মধুসূদন নর্টনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন পাওয়েল্ স্কুলের হেডমাষ্টার। নর্টনের চিঠি

নিয়ে মধুসূদন এঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এঁর ব্যবহারে ও পাণ্ডিত্যে প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তখন মধুসূদনের উপযুক্ত কোনও পদ খালি ছিল না। এ সুযোগ হল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। সেই বৎসর ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক বাওয়ার্স্ ছুটি নিয়ে দেশে যান। মধুসূদন তাঁর জায়গায় অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হলেন। সে যুগে ইংরেজী শিক্ষকতার দায়িত্ব এ দেশীয় লোকের উপর ন্যস্ত হত না। তাই মধুসূদনের এই নিয়োগে অভিনবত্ব আছে, এবং তাঁর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। এই সরকারী চাকুরী গ্রহণের ফলেই তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্কুলের সহিত একটি কলেজ বিভাগ সংযুক্ত হল। বাওয়ার্স্ দেশ থেকে প্রত্যাগমন করে কলেজ বিভাগে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হলেন। তখন মধুসূদন তাঁর স্থলে স্থায়ী হলেন। পরে এই ইউনিভার্সিটি কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়, এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করে। স্বাভাবিক নিয়মে মধুসূদন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হল না।

মাদ্রাজে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মেছিল। মধুসূদনের এখন যা আয় তাতে বিশেষ অভাব হবার কথা নয়। তথাপি সীমিত আয়ের উপর নির্ভর করে মিতব্যয়িতায় অনভ্যস্ত মধুসূদনের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা খুব সুখের ছিল না নিশ্চয়। রেবেকাও সঙ্গতিপন্ন প্লাণ্টারের কন্যা। তিনি যে অভাবগ্রস্ত জীবন বেশী দিন হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন তা মনে হয় না। তা ছাড়া উভয়ের রুচি ও মেজাজ এক রকমের নয়, অথচ জিদ্ দুজনেরই সমান। রেবেকার সমাজ আছে, ধর্ম আছে, লোকাচারের দাবী আছে। মধুসূদন তাঁর নিরবকাশ কার্যতালিকার যে বিবরণ গৌরকে দিয়েছেন, তা মেনে নিয়ে তার সঙ্গে মানিয়ে চলা রেবেকার পক্ষে কতদূর সম্ভব ছিল তা ধারণা করা যায়। মেরী পাওয়েল্ তিন সপ্তাহের মধ্যে

প্রায় অনুরূপ অবস্থায় অধ্যয়নমগ্ন মিলটনকে ত্যাগ করে পিতৃগৃহে চলে গিয়েছিলেন। রেবেকা ত মধুসূদনের সঙ্গে সাত বৎসর সুখে-দুঃখে সহ্য করেছিলেন।

কিন্তু কোনও জোড়াতালি দেওয়া আপোষের মধ্যে শান্তিতে কালাপহরণ মধুসূদনের স্বভাব-বিরুদ্ধ। রেবেকা ভাগ্যের নিকট জামিন দিয়েছেন, তিনি অনেকটা নিরুপায়। কিন্তু মধুসূদনের সহনশীলতায় যে সীমা আছে, তার আনাচে-কানাচে কোথাও আছে প্রলোভনের হাতছানি কোথাও বা কারও কটাক্ষের কুটিল ইঙ্গিত দিনের পর দিন ঘরে যতই অশান্তি পুঞ্জীভূত হল, বাইরে অভিসারের সঙ্কেত তাঁর নিকট ততই দুর্বার হয়ে উঠল এরূপ অবস্থায় স্বীয় কর্তব্যে আত্মসংস্থ হবার মত শক্তি বা প্রবৃত্তি মধুসূদনের কোনও দিন ছিল না। তাই অনির্দেশের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ অবস্থার বৈগুণ্যে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠল। সাধারণ বিচারে এটা তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি; কবির পরিচয়ে এটাই তাঁর জীবনকে পরবর্তী কালে সার্থক করেছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

মাতৃবিয়োগের পর থেকে কলকাতায় মধুসূদনের কোনও খবর নেই। গৌর বসাক চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু উত্তর পেলেন না; তাঁর কাছে 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্‌' নিয়মিত আসত, তাও বন্ধ হল। ফলে তাঁর ঔৎসুক্য অভিমানে পরিণত হল; তিনিও পত্র লেখা বন্ধ করলেন। বন্ধু যদি বন্ধুকে এত সহজে ভুলতে পারে কি ভুলতে চায়, তাকে ভুলতে দেওয়াই ভাল। মধুসূদনের এ যেন আত্মীয়-স্বজনের কাছে আত্মবিলোপের ঐকান্তিক সাধনা। আর একদিনের কথা মনে পড়ে যায়: সেই দশ বৎসর পূর্বে ফোর্ট-উইলিয়াম-এর গির্জা ঘরে যে-দিন বন্ধুর মুখে মায়ের অবস্থার করুণ বর্ণনা শুনে সহসা কোনও কথা না বলে একটি ছোট্ট নমস্কার করে কক্ষ ত্যাগ করলেন। এ যেন গভীর বিরাগভরে অতীতের প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন। অথবা এ বুঝি আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনায় পূর্ব-মুহূর্তের থম্‌থমে ভাব।

তথ্যবিরল জীবনের ইতিবৃত্ত রচয়িতার কাজ অনেকটা আবহাওয়া বিশারদের মতন: তাপমান যন্ত্রে অতি সামান্য তারতম্য অনেক সময়ে তাঁর নিকট অমূল্য সংকেত বলে মনে হয়। এই সামান্য সংকেতের উপর নির্ভরশীল অনুমান সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল হয় না বটে; তথাপি তথ্যনির্ণয়ের কাজে এই সামান্য ইঙ্গিতের মূল্য অনেক। তেমনি জীবনী-রচয়িতার পক্ষে অনেক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যপ্রমাণের অভাবে সামান্যতম সংকেতের সূত্র ধরে অগ্রসর হলে প্রকৃত অবস্থা হয়ত নির্ণীত হয় না, কিন্তু অবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ধারণা করা সম্ভব।

মধুসূদন ১৮৫২ থেকে ইউনিভার্সিটি কলেজের স্কুল-বিভাগে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। রিচার্ডসনের প্রি

ছাত্র গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিশ্চয় সন্তুষ্ট হয়েছেন। অনবদ্য বাচনভঙ্গী, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বহুভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য মাদ্রাজের শিক্ষিতমহলে তাঁকে এমন একটি সম্মানিত স্থান দিয়েছিল যা বহুদিন পর্যন্ত মাদ্রাজের অধিবাসীরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতেন। হঠাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দেখি একটি নূতন ভূমিকায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। ঐ বৎসর "য়্যাংলো-স্যাক্সন ও হিন্দু" নামে একটি বক্তৃতা-পর্যায়ের প্রথম ভাষণ প্রকাশ করলেন। পুস্তিকাটি অপ্রাপণীয়, তাই তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা সম্ভব নয়। তাহলেও বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্ব আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। সহসা তিনি দুটি প্রান্তিক জাতি বা সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন কেন? এ কি শুধু তত্ত্বানুসন্ধানার নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ— মধুসূদনের জীবনে যা কোনও দিন ছিল না? না, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনও মৌলিক স্তর থেকে কবির মনে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল? স্মরণ করা প্রয়োজন দীর্ঘ সাত বৎসর য়্যাংলো-স্যাক্সন মহিলার সহিত তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। য়্যাংলো-স্যাক্সন চরিত্রের দোষ-গুণের সহিত বাঙালীর প্রকৃতিগত বৈষম্য তিনি পদে পদে উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধি ক্রমশঃ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহারে সংক্রমিত হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ মাতৃবিয়োগের পর মধুসূদনের একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি সংবাদ পেয়ে কলকাতায় ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু মায়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সান্ত্বনা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। যে মায়ের জীবনস্বপ্নকে তিনি বিনষ্ট করেছিলেন, অথচ যাঁর স্নেহাশীর্বাদের স্নিগ্ধ পরশ তিনি সুদূর মাদ্রাজে পর্যন্ত অনুভব করতেন, তাঁর শেষ স্মৃতির সামান্য সম্বলটুকুও তাঁর রইল না। "যেমন কোনও ব্যক্তি কোনও পরম-পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে তাঁদের প্রতিমূর্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্বদা

ধ্যান করে" (শর্মিষ্ঠা নাটক ৩৷৩), তাঁরও সেইরূপ জনক-জননীকে ভক্তিভরে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা ব্যতীত আজ আর কোনও সান্ত্বনা নেই। তাঁর জীবনের এ আফশোষ অন্তরতম বন্ধুকেও বলবার মত নয়; বললে শুনতে হত অনুযোগ কিম্বা উপদেশ;—দুই-ই অসহনীয়। শেক্‌স্‌পীয়ার বলছেন, "দাঁতের ব্যথা সহ্য করতে পারে এমন দার্শনিক আজও জন্মায় নি", আর মধুসূদনের এ-ত মনের মর্মান্তিক যন্ত্রণা। গৌরদাসের সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করার এ ছাড়া আর কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? স্বভাবতঃ চিন্তামুক্ত সদালাপী হাস্য-পরিহাসে অভ্যস্ত মধুসূদনের এ মানসিক পরিবর্তন বোঝবার মতন অন্তর্দৃষ্টি বা স্বাভাবিক সহানুভূতি রেবেকার কোথায়? বিশেষতঃ আজ রেবেকার যৌবনের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। একদা যে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা তাঁকে অভিভূত করেছিল, সামান্য শিক্ষকতায় তার পর্যবসান নিশ্চয় তাঁকে নিরাশ করেছিল। তা ছাড়া রাজভাষায় কাব্যরচনায় সফলকাম কবি আজ নিকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত বটতলার রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে কি করে ডুবে থাকতে পারেন, ইংরাজ-তনয়ার পক্ষে তা উপলব্ধি করা কি সম্ভব ছিল? তিনি কি করে জানবেন মধুসূদনের নিকট এ কাব্যগ্রন্থ দুখানি জননীর স্মৃতি-সৌরভে সুরভিত, মাতৃভাষার মধুর আবেদনে পরিপ্লুত। অপর পক্ষে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি স্বামীর আসক্তি যে-কোনও অল্পশিক্ষিত অথচ ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানের নিকট একটা অশুভ সংকেত বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যখন দেখা গেল মধুসূদন গির্জা যাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছেন, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই,—তখন হয়ত রেবেকার ক্ষুব্ধ মনে স্বামী সম্বন্ধে অভিমান ইস্‌-আয়ার প্রশ্নে প্রতিধ্বনিত হত: "হে উষার বরপুত্র লুসিফার, তোমার এ কি অধঃপতন?" আমরা রেবেকাকে দোষ দেব না। রুচির অমিল, মনের বিরোধ, আশার মোহভঙ্গ—সব কিছু মিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্রমশঃ একটা দুরতিক্রমণীয়, লবণতিক্ত, ঊর্মিমুখর

সাগরের ব্যবধান সৃষ্টি হল—যার প্রমাণ নেই কারণ তার কোনও বাহ্য প্রকাশ নেই। মনের গভীরতম স্তরের আবেগস্পন্দন আত্ম-সচেতন মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়ঃ "সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর, কলকল ভাষা নীরব তাহার।" সাধারণ অভাব-অভিযোগের তাড়নায় মধুসূদনের কথায় বাঁধন নেই। গভীর বেদনায় তিনি চিরদিনই স্তব্ধ, আত্মসমাহিত।

জীবনের এই করুণ সঙ্কট মুহূর্তে আঁরিয়েৎ-এর সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। আমাদের কাছে আঁরিয়েৎ প্রায় অজ্ঞাত-কুলশীল। কিম্বদন্তী আছে তাঁর পিতা ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। যদি তাই হয়, সম্ভবতঃ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ঐ বিদ্যাসংস্থায় যোগ দেবার পর এই ফরাসী পরিবারের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতার সূচনা। পরে রেবেকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অসদ্ভাব তাকে আঁরিয়েৎ-এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ফরাসিনীদের মায়াবিনী বলে একটা খ্যাতি আছে। জনৈক ইংরাজ লেখক বলেছেন, "মনকে মায়াবিষ্ট করবার ক্ষমতায় ফরাসী রমণীর জুড়ী নেই।" মধুসূদনের প্রকৃতি চিরদিনই অনুরাগপ্রবণ। জীবনের ঘনায়মান সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে এই মমতাময়ী মহিলার বন্ধুত্ব তার পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল বলে মনে হল। রেবেকা ইংরাজ প্লান্টারের কন্যা; মনে হয় ধর্মে তাঁর আসক্তি প্রগাঢ়; তিনি প্রকৃতিতে মধুসূদনের মতই জেদী,—স্বেচ্ছায়, আত্মীয়দের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে, তিনি মধুসূদনকে বিবাহ করেছিলেন। আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি নিজের কাছে অপমানিত, সমাজের চক্ষে করুণার পাত্রী। তবুও পুত্র-কন্যার দিকে চেয়ে এইভাবে মুখ বুজে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেবার মতন আত্মবল ও আত্মসম্মান তাঁর ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁকে নারীর পক্ষে যা চরম অপমান,—স্বামীর অপরাগতি —তারই সম্মুখীন হতে হল। মধুসূদনের জীবনে আঁরিয়েৎ-এর আবির্ভাবে রেবেকার অবস্থার শোচনীয়তা পরিস্ফুট হল।

তাকেই বলি মানুষের চরম দুর্গতি যখন স্বভাবের তাড়নায় বা ঘটনার প্রভাবে মানসিক প্রবণতা অবাঞ্ছিত অবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে এই পরিণতিকে স্বার্থের প্রয়োজনে আয়ত্ত করবার শক্তি মধুসূদনের ছিল না। তাঁর স্বভাবের সহজ এবং প্রসন্ন অভিব্যঞ্জনার জন্য পরিবেশের আনুকূল্য ও বন্ধুদের প্রশংসা অপরিহরণীয় ছিল। একদা বৈদেশিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তার সঙ্গে একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হল যে, ধর্ম নিতান্তই বহিরঙ্গীয় ব্যাপার: সমাজের মধ্যে সংকীর্ণ গোষ্ঠী বা সংঘ বিরচণে এর সংহতি শক্তির সার্থকতা হয়-ত আছে; কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিমানসের মূলসত্তাকে অনুপ্রাণিত করবার সাধ্য কোনও ধর্মেরই নেই। মধুসূদন খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রাণসত্তা কোনও দিন তা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নি; ফলে বিদেশী সমাজে একরকম পরগাছা হয়েই রইলেন। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ হয়-ত এই পরভৃতিক অবস্থায় পরানুগ্রহ সেবনে পরিতুষ্ট হতে পারে, কিন্তু যে-কোনও শক্তিমান পুরুষের পক্ষে এ অবস্থা বরদাস্ত করা সহজ নয়। মাদ্রাজে সাহেব-সুবোর প্রশংসা নিয়ে মধুসূদন প্রথম দিকে আস্ফালন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর কামনা করেছিল কলকাতার বিদ্বদ্‌জনসমাজের বিচার, এবং অবশেষে তার দ্বারাই তিনি পরিচালিত হয়েছিলেন। নর্টন্‌-এর পৃষ্ঠপোষকতা, রেবেকার কৃপানুগ্রহ, খৃষ্টান সমাজের মুরুব্বীয়ানা, এ যেন "রুদ্ধঘরের ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি"—তাঁর পক্ষে দিন দিন অসহনীয় হয়ে পড়ল। জীবন-সমীক্ষায় যার প্রয়োজন ছিল, পরীক্ষা পর্যায়ে তাকে অতিক্রম করা আত্মপ্রসারের প্রয়োজনে অনিবার্য। তাই রেবেকা-কে পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্পে তিনি কোনও নৈতিক দ্বিধা বা বিবেকের দংশন বিন্দুমাত্র অনুভব করেন নি—যেমন শেলী করেন নি হ্যারিয়েট্‌কে বিসর্জন দিতে।

মধুসূদনের সহিত রেবেকার সম্পর্ক ক্রমশঃ কোন্ স্তরে অবনমিত হয়েছিল, তা ঘটনার ইঙ্গিত অনুসরণ করে অনুমান করা যায়। গৌরদাসকে লিখিত পত্র থেকে ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, ডিসেম্বর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে ইউনিভার্সিটি স্কুলের সহিত তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল এবং সংবাদপত্র সম্পাদনা তাঁর একমাত্র উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ালো। রেবেকার সহিত তাঁর মনোমালিন্য কোথায় এসে ঠেকেছিল এ তারই প্রমাণ এ আর ঘরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, মাদ্রাজে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। একবার সমাজে কোনও ব্যক্তির দুর্নাম রটলে, তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ হাজির করে তাঁকে অপদস্থ করবার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করাই স্বাভাবিক রীতি। মধুসূদনের চরিত্রে ক্রটি-বিচ্যুতির অভাব ছিল না। তিনি পানাসক্ত, অমিতব্যয়ী, ধর্মে উদাসীন, কর্মে স্বেচ্ছাচারী। নর্টন-এর বন্ধুত্ব মাদ্রাজে তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তিব মূলে ছিল। নর্টন্-এর সমর্থনে ও সহায়তায় তিনি রেবেকাকে বিবাহ করেছিলেন, ইউনিভার্সিটি স্কুলে সম্মানিত পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নর্টন্ তাঁর প্রতি বিরূপ হলে তাঁর অবস্থা কি হতে পারে কল্পনা করা শক্ত নয়। আজ সব অনুযোগ-অভিযোগের উপর যখন অঁারিয়েৎ-এর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা পল্লবিত হয়ে সমাজে প্রচারিত হল, তখন তাঁর সপক্ষে আর কেহই রইল না। যে বিবাহে তিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন, তার এ পরিণতিতে নর্টন্-এর আত্মগ্লানি হওয়া স্বাভাবিক; মধুসূদন তাঁর সমস্ত আশা এবং অভিপ্রায়কে ধূলিসাৎ করেছেন। মেকলে বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের নীতিবোধ কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত হলে, তাঁর আর রক্ষা নেই। তখন তাঁর কোনও সদ্‌গুণ বা প্রতিভা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। এর কবলে পড়ে বায়রন, শেলী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; শতাব্দীর শেষে মহাপ্রাণ পার্নেল রাজনীতিক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

প্রায় অনুরূপ অবস্থায় এই নিরবলম্বন বঙ্গযুবকের অদৃষ্টে যা ঘটেছিল তা অনুমান করতে প্রামাণ্য দলিলের প্রয়োজন হয় না। ইউনিভার্সিটি স্কুল সরকারের সাহায্যপুষ্ট ইংরাজ-পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রেবেকা ইংরাজ ললনা; তাঁর প্রতি অভব্য আচরণ তাঁর সমাজের কেহই ক্ষমা করবে না। তাই মনে হয় রেবেকার সহিত অসদ্ভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চিঠিতে মধুসূদন গৌরের নিকট তাঁর আর্থিক দুর্গতি ও কর্মজীবনে অসাফল্য নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। যদি তিনি ইউনিভার্সিটি স্কুলে বহাল থাকতেন, এ জাতীয় আক্ষেপের কোনও সঙ্গত কারণ থাকতো না। তাঁর পদমর্যাদার কথা বাদ দিলেও শিক্ষাব্যবস্থার আসন্ন পরিবর্তনে কলকাতায় হিন্দু কলেজের মত মাদ্রাজেও ইউনিভার্সিটি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নবপ্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজে নিশ্চয় অধ্যাপক নিযুক্ত হতেন। শিক্ষা-সংস্কারের প্রাথমিক ব্যবস্থা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই সুরু হয়েছিল— এবং তার আওতায় নিজের উন্নতির সম্ভাবনা মধুসূদনের অজানা ছিল না। অতএব তাঁর আক্ষেপের আসল কারণ এই যে, এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে; তিনি ইউনিভার্সিটি স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মাত্র এই কারণেই তাঁর ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে পারে, এবং এই কারণেই এখন 'স্পেক্টেটর'-এর সম্পাদকতা তাঁর জীবিকার প্রধান অবলম্বন। সরকারের কর্মচারীর পক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদনায় বাধার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে।

এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় রেবেকার সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। কিন্তু সে-যুগে বিবাহবন্ধনের অবসান এক পক্ষের নৈতিক পদস্খলন ছাড়া সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের চরিত্রের এ জাতীয় ত্রুটি কোনও কালেই ছিল না।

রেবেকাও সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। এই অবস্থায় আঁরিয়েৎ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মধুসূদনকে নিষ্কৃতির একমাত্র পথ দেখিয়ে দিল। কিন্তু মাদ্রাজের সমাজে তাঁর অখ্যাতি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করেছে; এর উপর আঁরিয়েৎকে বিবাহ করবার অভিলাষে প্রাক্‌বৈবাহিক ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ সৃষ্টি করে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করলে মাদ্রাজে বসে উপার্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। অথচ সহরে তবু তাঁর উপায় আছে; অন্যত্র অপবাদের বোঝা নিয়ে নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার আশা খুবই সন্দেহজনক। এই প্রকার জটিল অবস্থার মাঝে কলকাতা থেকে এল প্রত্যাবর্তনের অপ্রত্যাশিত আহ্বান দেবাশীর্বাদের মতন।

যদি কোনও ঔপন্যাসিক কাহিনীর সঙ্কটমোচনের প্রয়োজনে আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করেন, এই অবতারণা-পদ্ধতিকে সমালোচক অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব বলে নিন্দা করে থাকেন। অথচ মধুসূদনের এই জীবন-মরণ সঙ্কটে আকস্মিক যোগাযোগের পৌনঃপুনিকতা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। ১৫ই জানুয়ারী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু হয়। মধুসূদন খৃষ্টান হবার পরে পিণ্ডাধিকারী পুত্রকামনায় অধীর হয়ে তিনি তিনবার দারপরিগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আশা নিষ্ফল হয়েছিল। এই কারণে বিধর্মী পুত্রের বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষের অবধি ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহপ্রযুক্ত হয়েই হোক অথবা জাহ্নবী দেবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশতঃই হোক, তিনি প্রসন্ন ঠাকুরের মত পুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। কথিত আছে মৃত্যুশয্যায় আত্মীয়েরা তাঁকে বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলে তিনি নাকি বলেছিলেন, "যার বিষয় সেই এসে নেবে।" ইংরাজের নূতন আইন অনুসারে ধর্মান্তরিতকে পৈতৃক সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাই রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর আত্মীয়েরা মধুসূদনকে কোনও সংবাদ না দিয়ে অথবা তাঁর সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান না

করে সম্পত্তি হস্তগত করবার চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। কিন্তু কথায় বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়েঃ ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিসম্বাদের আপোষ না হওয়াতে চক্রীর দল বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হলেন। মধুসূদনের কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি, রাজনারায়ণ কর্তৃক সম্পাদিত একখানি ব্যবস্থাপত্র আছে—এই জাতীয় কাহিনী প্রচার করে দাবীদারেরা যে-যার নিজের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন। তাঁদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক এই সময়ে মধুসূদনের চিরবন্ধু গৌরদাস বসাক আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে সমাসীন, এবং খিদীরপুরেই বাস করছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ফার্গাসন্ তাঁর উপর মামলা-সংক্রান্ত তদন্ত করবার ভার অর্পণ করলেন।

বহুদিন পরে গৌরদাস পুনরায় যৌবনের মধুরতম দিনগুলির লীলাক্ষেত্র রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। সেদিনের সেই সতত উৎসব-কলরবে মুখরিত আনন্দধাম আজ নিস্তব্ধ, বিষাদমগ্ন। রাজনারায়ণের নিকটতম আত্মীয়েরা কুৎসিত কলহ-বিসম্বাদে ব্যাপৃত। তাঁর বিধবাদের মধ্যে একজন মৃত; একজন পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; অপরজন অনাদর এবং অবহেলায় জ্ঞাতি-কলহের বিষাক্ত আবহাওয়ায় কোনও ক্রমে কালাতিপাত করছেন। গৌরদাস দাবীদারদের তলব করে শুনলেন তাঁরা নাকি মধুসূদনের সংবাদ সংগ্রহের সব রকম চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন; অপর পক্ষে তিনি ইহজগতে নেই এমন মনে করবারও কারণ আছে। তাঁরা একখানি ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করলেন বটে, কিন্তু হাকিমের সম্মুখে তা হাজির না করাতে গৌরদাসের মনে বিলক্ষণ সন্দেহের উৎপত্তি হল। ফলে তিনি উপরওয়ালাকে জানালেন সম্পত্তির আসল উত্তরাধিকারী খৃষ্টান এবং মাদ্রাজবাসী। তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অতএব মামলাটি আপাততঃ তদন্তাধীনভাবে মুলতুবী রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু মধুসূদন সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় কি করে? তাঁকে সংবাদ দেওয়াই বা কেমন করে সম্ভব? বহুদিন তাঁর কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি জীবিত কি মৃত তাও অজানা। পত্র দিলে উত্তর পাওয়া যায় না। সরকারী দপ্তরের সহায়তায় হয়ত খবর পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু লালফিতার দীর্ঘসূত্রতা কে না জানে। এইত মাত্র সেদিন ডিকেন্স্ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসে ইংলণ্ডের সরকারী দপ্তরকে 'তালগোল-পাকাবার দপ্তরখানা' বলে হাসাহাসি করেছেন। কিন্তু ঘটনাচক্র পুনরায় সহসা মধুসূদনের অনুকূলে আবর্তিত হল। যখন গৌরদাস মধুসূদনের অজ্ঞাতবাসের যবনিকা ভেদ করবার উপায় চিন্তা করছেন, এমন সময়ে খবর পেলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং গির্জা-সংক্রান্ত কোনও কার্য উপলক্ষে মাদ্রাজ অভিমুখে শীঘ্রই রওনা হবেন। এ কাজের জন্য এঁর চেয়ে উপযুক্ত দূত আর কেউ হ'তে পারে না। হিন্দুদের চক্রান্তে একজন খৃষ্টান যুবক পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহন কখনই উদাসীন থাকতে পারেন না। গৌরদাস কৃষ্ণমোহনের হাতে রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মধুসূদনকে একখানি বিস্তারিত চিঠি দিলেন, এবং তাঁর কলকাতায় প্রত্যাগমনের আশু প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ করে বুঝিয়ে লিখলেন।

১লা ডিসেম্বর তারিখের এই চিঠি ২০শে তারিখে মধুসূদনের হস্তগত হল। কৃষ্ণমোহন চিঠিখানি নিজহস্তে মধুসূদনকে দিয়েছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে কোনও বিবরণ মৌখিক বা লিখিতভাবে কোথাও দেন নি। এ থেকে অনুমান হয় মধুসূদনের আচার-আচরণে কৃষ্ণমোহন প্রীত হন নি। মাদ্রাজের খৃষ্টান মহলে তাঁর কলঙ্ক-কাহিনী যে গুঞ্জন সৃষ্টি করেছিল, তা নিশ্চয় মৃদু ছিল না। কলকাতায় ফিরেও কৃষ্ণমোহনের অথবা বাঙালী খৃষ্টীয় সমাজের সঙ্গে মধুসূদনের কোনও সৌহার্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। নৈতিক শিখরের

শীর্ষে সমারূঢ় কৃষ্ণমোহনের বা অপরাপর শিক্ষিত খৃষ্টানের পক্ষে মধুসূদনের পদস্খলন ক্ষমা করা অসম্ভব।

মধুসূদন সেই দিনই 'স্পেক্‌টেটর' অফিস থেকে গৌরদাসের পত্রের উত্তর দিলেন। এই চিঠিখানি তাঁর জীবনী সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান দলিল। এ থেকে আমরা জানতে পারি, প্রথম, তিনি এখন 'স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার উপ-সম্পাদক; তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই। ইউনিভার্সিটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করে তিনি 'হিন্দু ক্রনিক্‌ল্'-এর সম্পাদকতা ত্যাগ করেছিলেন; এখন ইউনিভার্সিটি স্কুল ত্যাগ করেই তিনি পুনরায় পত্রিকা সম্পাদকত্বে নিযুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়, তিনি বন্ধুকে তাঁর জীবনের অসাফল্য ও স্বপ্নভঙ্গের কথা জানালেন। ইউনিভার্সিটি স্কুলে যদি তাঁর চাকরী বহাল থাকত এ আক্ষেপ নিরর্থক হত। তৃতীয়, তাঁর এমনই দুরবস্থা যে, পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ না জানলে তিনি তার উদ্ধারের জন্য অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত ন'ন। অর্থাৎ মাদ্রাজ ত্যাগ করবার সঙ্কল্প এখনও তাঁর মনে উদয় হয় নি। চতুর্থ, তিনি এখনও রেবেকা ও পুত্রকন্যার সহিত একত্র বসবাস করছেন, যদিও তাঁর সঙ্গে এখন এমনই সম্পর্ক যে, পিতৃবিয়োগ এবং কলকাতা গমনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করবার কথা তাঁর একবারও মনে হল না। সাত বৎসর পূর্বে যে মধুসূদন কথায় কথায় খুঁটিনাটি নিয়ে 'মিসেস্ ডি'কে জানাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন, আজ একটি শুষ্ক তথ্যের মধ্যে তাঁদের সম্পর্ক সমাপ্ত।

কিন্তু পত্র শেষ করবার পূর্বেই তিনি বন্ধুকে জানাচ্ছেন যে, সম্ভব হলে তিনি ২৭শে ডিসেম্বরে মাদ্রাজ ত্যাগ করবেন। কয় মিনিটের মধ্যে মনের এই সহসা পরিবর্তন বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য।

স্বর্গীয় ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে অমূল্য তথ্যসঙ্কলনের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে একটি চমকপ্রদ সংযোজন সন্নিবেশ করেছেন। রাজনারায়ণ বসু গৌরদাসকে লিখছেন, "তুমি আমাকে বলনি—আমি অন্যসূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে—যে-মহিলার সঙ্গে মধু স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করতেন, একদা তাঁকে নিয়ে তিনি পলায়ন করেছিলেন (eloped)।" এই কেলেঙ্কারী কোন্ সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, তার কোথাও উল্লেখ নেই। ১০শে ডিসেম্বরে তিনি রেবেকার সঙ্গে বসবাস করছেন। অতএব এ ঘটনা এর পরে কোনও সময় ঘটেছিল বলে ধরে নিতে হবে। মাদ্রাজে থেকে এরূপ একটা কেলেঙ্কারীতে প্রকাশ্যে লিপ্ত হওয়া মধুসূদনের পক্ষে বিশেষ নিরাপদ হত না। কিন্তু অঁরিয়েৎ-কে নিয়ে যদি হঠাৎ কলকাতায় চলে যেতে পারেন, তা হলে অতি সহজেই তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। সম্ভবতঃ এই প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে সহসা উদয় হওয়াতে মধুসূদন ২৭শে ডিসেম্বরে রওনা হবার সম্ভাবনার কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। এ জাতীয় পরিকল্পনার নিষ্পত্তি অত সহজে হয় না। এখানে আর এক পক্ষ আছেন—এই হঠকারিতায় তাঁকে রাজি করাতে হবে। তার মনের শত অনুমোদন সত্ত্বেও তিনি কুমারী : স্বাভাবিক সঙ্কোচ, পরিণামের আশঙ্কা, সংস্কারের পিছুটান পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এসব অতিক্রম করতে হলে সময় চাই। মধুসূদনকেও পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে; যথেষ্ট গোপনতা অবলম্বন করে ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন দু-একদিনে তার আয়োজন করা অসম্ভব। এই সব কারণে তিনি ২৭শে তারিখে রওনা হতে পারলেন না; যাত্রার দিন বিলম্বিত হল।

এ দিকে কলকাতায় গৌরদাস অধীর আগ্রহে মধুসূদনের পত্রের আশায় অপেক্ষা করছেন। অবশ্য বন্ধুর ইহজগতে অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা শীঘ্রই অভাবিতভাবে নিরসন হল। হঠাৎ 'হরকরা'তে 'স্পেক্‌টেটর' থেকে দু' একটি উদ্ধৃতি তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, যার প্রতিছত্রে মধুসূদনের অননুকরণীয় রচনাভঙ্গীর পরিচয় পরিস্ফুট। 'বাবু' শব্দের বানানেই লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় :—সে যুগে Baboo বানান প্রচলিত ছিল ; Babu মধুসূদনের প্রবর্তিত। এ ছাড়া এমন স্পষ্ট ঋজু জোরালো ইংরাজিতে ভাবপ্রকাশ করবার ক্ষমতা সে যুগে অন্য কারও ছিল না। বন্ধু এখনও জীবিত আছেন এ সম্বন্ধে গৌরদাস সন্দেহমুক্ত হলেন।

জানুয়ারীর প্রারম্ভে গৌরদাস মধুসূদনের চিঠি পেয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। যখন এলেন না, ৫ই জানুয়ারী তাঁর পত্রের উত্তর দিলেন। বিশেষ করে কলকাতায় তাঁর অবিলম্বে আসার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা পুনরায় বুঝিয়ে দিলেন। এ কথাও তিনি জানালেন যে, কলকাতায় তাঁর জন্য বিরাট কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত। শিক্ষকতায় অভিরুচি হলে নূতন ব্যবস্থায় তাঁর সুযোগের অভাব হবে না। যদি সংবাদপত্র সম্পাদনা তাঁর বাসনা হয়, তারও সুযোগ প্রচুর ; এমন কি গৌরদাস নিজে তাঁর জন্য একখানি সংবাদপত্র স্থাপন করতে পারেন। বন্ধু-বান্ধব সকলের সমবেত ইচ্ছা, তিনি যেন কালাপহরণ না করে কলকাতায় এসে তাঁর যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন।

ইত্যবসরে কোনও এক দিন মধুসূদন আঁরিয়েৎ-কে রাজী করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। এক ফুৎকারে তাঁর তাসের ঘর ভেঙ্গে দিলেন। রেবেকা এখন অনায়াসে তাঁকে ডিভোর্স করতে পারবেন। তখন উভয়ই অবাঞ্ছিত বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কিন্তু রেবেকা সম্ভবতঃ তাঁকে এ মুক্তি দেন নি। আজ পর্যন্ত কোনও

ডিভোর্স-এর মামলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায় নি। স্বামীর বিরুদ্ধে এই ছিল রেবেকার চরম প্রতিহিংসা।

Heaven has no rage like love to hatred turned:
Nor Hell a fury like a woman scorned

—[যে অনুরাগ বিরাগে পরিণত হয়েছে তার তুলা রাগ স্বর্গেও নেই,
আর অবজ্ঞাত নারীর সমতুল্য রোষপরুষ রমণী নরকেও নেই]

রেবেকার চরম পরাজয়ের দিনে অন্ততঃ তাঁর এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, তিনি শেষ পর্যন্ত স্বামীকে আমৃত্যু ধর্মের বিচারে পাপী প্রতিপন্ন করে স্বর্গের প্রবেশদ্বারে তাঁর জন্য চিরকণ্টক রোপণ করে রাখতে পেরেছেন। রেবেকা ধর্মপরায়ণ খৃষ্টান; পাপ-নিমগ্ন স্বামীর 'ইন্‌ফার্ণো'-এ অধোগতি অবধারিত,—এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

মধুসূদন মাদ্রাজ ত্যাগ করলেন একাকী, ছদ্মনামে, এবং অত্যন্ত সঙ্গোপনে। জাহাজের নাম 'বেন্টিঙ্ক'; তাঁর নিজের ছদ্মনাম 'মিঃ হোল্ট্'। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন হয়-ত এই আশঙ্কায় যে, শেষ পর্যন্ত রেবেকা আদালতের সাহায্য নিয়ে তাঁর পলায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন; ডিভোর্স মামলা অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা থাকলে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে মাদ্রাজে আটক রাখাই সঙ্গত; তাতে তাঁর কৃতকর্মের জন্য তাঁকে চূড়ান্ত অপমানেরও সম্মুখীন হতে হত। রেবেকা যে তাঁকে ডিভোর্স না-ও করতে পারেন এ সন্দেহ মধুসূদন বা আঁরিয়েৎ কারও মনে হয় নি; হলে অন্ততঃ আঁরিয়েৎ 'ইলোপমেন্ট্'-এ সহসা রাজি হতেন না। তা ছাড়া কলকাতায় কপর্দকহীন অবস্থায় পৌঁছে বিশপ্‌স্ কলেজ ছাড়া অন্যত্র আশ্রয় সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিবাহ-শপথ ভঙ্গকারী পলাতক মধুসূদনের পক্ষে স্বনামে কলেজে প্রবেশ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু ঘনকৃষ্ণ গালপাট্টার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন মিঃ হোল্ট্ কারও সন্দেহ উদ্রেক না করে কলেজের আতিথ্য কয়েক দিনের জন্য লাভ করতে পারবেন। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে শ্মশ্রু-শোভিত মিঃ হোল্ট্-এর মধ্যে সেদিনের তরুণ মধুসূদনকে কে সনাক্ত করবে?

এইভাবে ছদ্মবেশে ছদ্মনামে অপরাধীর ন্যায় সঙ্গোপনে মধুসূদন ২রা ফেব্রুয়ারী পুনরায় বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবেশ করলেন, এবং অবিলম্বে গৌরকে গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তাঁর আগমনের সংবাদ আপাততঃ যেন লোক-জানাজানি না হয়, গৌরকে বিশেষ করে সতর্ক করে দিলেন। খৃষ্টান মহলে মাদ্রাজ কেলেঙ্কারীর বহুল প্রচার-সম্ভাবনায় স্বাভাবিক উদ্বেগ এই গোপনতা অবলম্বনের কারণ। কলকাতায় ফিরে মধুসূদন কেন শিক্ষাবিভাগে চাকরী পেলেন না, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সমর্থন পেলেন না, খৃষ্টান সমাজে সমাদৃত হলেন না—তার রহস্য এখন অতি স্পষ্ট। অবশ্য আপাততঃ কলকাতায় যখন এসে পৌঁছেছেন, তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবার পরে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করলেই চলবে। আঁরিয়েৎকে নিয়ে আসবেন ডিভোর্স-এর জন্য আইন-নির্দিষ্ট পূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে। ততদিনে কলকাতায় আঁরিয়েৎ-কে ভরণ-পোষণ করবার মত একটা ব্যবস্থাও নিশ্চয় হবে।

পরিশিষ্ট

(ক) সংযোজন।

পৃঃ ১৯ ॥ "হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন" : দ্রষ্টব্য—প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার (১৯২৭), পৃষ্ঠা ৪৫৬ : —Datta, Rajnarain—Pleader, Sudder Dewani Adalat; father of Michael Madhusudan Datta. Macaulay praised him as a writer of very good English.

পৃঃ ২৮ ॥ 'কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই বাড়ীতে" : দ্রষ্টব্য—শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "মহাকবি রঙ্গলাল", পৃঃ ২০৫ : "১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট শনিবার কাশীপ্রসাদ ঘোষ খিদীরপুরে ২০ নং সারকুলার গার্ডেন রীচ্ রোডের বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হন এবং এখানে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্বাধিকারীর কাছে পালিত হন।" পৃঃ ২০৯ : "পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনকে তাঁর খিদীরপুরের বাটিতে (২০ নং সারকুলার গার্ডেন রীচ রোড) লইয়া আসেন।"

পৃঃ ২৯ ॥ "এই পার্থক্যের মূলে ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষা-দীক্ষা" : —এ সম্বন্ধে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, "তাঁর প্রতিভাবিকাশের অনুকূল পরিবেশ মধুসূদন পাইয়াছিলেন কপোতাক্ষতীরে জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে নয়, অথবা মাতৃভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মাদ্রাজ প্রবাসের বিজাতীয় সমাজেও নয়। সে অনুকূল পরিবেশ তিনি পাইয়াছিলেন কলিকাতায়,—ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজে, এবং লোকজীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজে। ফিউডাল সমাজ হইতে বুর্জোয়া সমাজের অভিবর্তনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয় গ্রাম হইতে শহরে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রধানতঃ নাগরিক সংস্কৃতি। কলিকাতার নাগরিকেরা তখন বাংলা সমাজের উন্নততর অংশ। কলিকাতার সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার প্রথম বাঙালী কবি মধুসূদনকে, যেমন করিয়া, বেন্ জন্সনের মতে সে যুগের লণ্ডন গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্স্পীয়রকে।" (সাহিত্যবীক্ষা, ১০৭-৮)।

পৃ: ৩৩ ॥ "গ্রামার স্কুল": দ্রষ্টব্য—হরিহর শেঠের "প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়", পৃ: ২৭১, ২৮৭, ৪৮৩।

পৃ: ৪০ ॥ "জে ব্যারেটের ব্যাঙ্ক": দ্রষ্টব্য মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র", পৃ: ৩৬।

পৃ: ৫৫ ॥ "কিশোরীচাঁদ বলেছেন" ইত্যাদি: দ্রষ্টব্য—মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র", ৩৪ পৃ:। এই 'বড়ে'দের সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন।

পৃ: ৫৬ ॥ "অধ্যাপক রীজ্": দ্রষ্টব্য—প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার (১৯২৭) পৃ: ৫০: "V.L. Rees—A Eurasion and a self-taught man. Professor of Methematics 6 November, 1835." শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ইনি "এক সময়ে সুবিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সৈন্যদলে সামান্য পদাতিক সৈন্য ছিলেন। তৎপরে নানা ঘটনা নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দু কলেজের গণিতাধ্যাপকের কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

পৃ: ৬১ ॥ "অধ্যাপক জোন্স্": "প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার (১৯২৭), ৪৮ পৃ: "Jones, Richard, Head Master, Junior Department, 1st November 1836".

পৃ: ৬৫ ॥ "কের্ সাহেবের সঙ্গে আদৌ বনিবনাও নেই": ইনিই সেই ইংরাজ-পুঙ্গব যিনি বিদ্যাসাগরীয় 'চপেটাঘাতে' অভ্যর্থিত হয়ে শিষ্টাচারে দীক্ষিত হয়েছিলেন। শ্রীবিনয় ঘোষ সঙ্কলিত সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাময়িক বাংলার সমাজ-চিত্র' গ্রন্থে সংবাদ-প্রভাকর থেকে এঁর সম্পর্কে জনৈক পত্রলেখকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ: "মিঃ জেম্স্ কার্ হুগলি কলেজের প্রিন্সিপেল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়া কত খেল খেলিতেছেন এবং স্বীয় অপূর্ব বুদ্ধির কৌশলে কত কত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী সঙ্কুচিত হয়েন। সম্প্রতি আবার এক অপূর্ব নিয়ম করিয়াছেন যে, যখন কোনও দর্শক কালেজে সমাগম পূর্বক কোন শ্রেণী দর্শন বা পরীক্ষা করিবেন তখন তচ্ছ্রেণীস্থ যাবতীয় বালক তাঁহার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইবেক।...সম্পাদক মহাশয়, কার সাহেব অভিনব ২ নিয়ম ধার্য

করত কেবল বিবেচকগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তিনি সকল প্রিন্সিপেল হইতে কৌন্সিল অফ্ এডুকেশনের নিকট যশস্বী হইবার প্রত্যাশায় কর্তব্যকর্মের অতিক্রম করিয়া কেবল উপহাস প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহার ন্যায় আশ্চর্য মানুষ ধরাতলে অতি বিরল, কি পাঠশালা সংক্রান্ত কি অপরাপর লোক তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রার্থনা করিলে অমনি স্বীয় স্বাভাবিক বদন-ভঙ্গিমায় মিষ্ট ভাষায় উত্তর প্রদান করেন 'তোমাদের বক্তব্য বিষয় আমাকে officially জ্ঞাত করাও,' হায়! প্রচার করিতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না যে একদা তাঁহার অধীনস্থ কোনও ছাত্র মলমূত্র ত্যাগ করণার্থে বাহিরগমন নিমিত্ত তাঁহার নিকট বাচনিক প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি পূর্বোক্ত উত্তর করিয়াছিলেন।" এই বিচিত্র চরিত্রের ইংরাজের বিরুদ্ধে মধুসূদনের বিরূপ মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

পৃঃ ৩৩॥ রাজনারায়ণ ১০০০্ 'পাঠিয়ে দিলেন: 'হরকরা' পত্র থেকে নিম্নোল্লিখিত উক্তি দ্বারা সমর্থিত: —"A thousand Rupees in Government security was sent to him with a request that he should immediately take his passage to England and get baptised there—that no obloquy might be cast on his family by his embracing Christianity on this spot. He refused." (February, 1843)

পৃঃ ৯৪॥ প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব: শ্রীবিনয় ঘোষ সঙ্কলিত 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে ধর্মত্যাগী হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের এক সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায়, "আমাদিকের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে, স্বধর্মত্যক্ত নেটিব খৃষ্টিয়ানদিগকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারা পুনর্বার স্বজাতি মধ্যে গ্রহণ করণের প্রস্তাব হইলে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকান্ত বাহাদুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর,* বাবু আশুতোষ দেব,

* ইনি রাজনারায়ণের বন্ধু এবং তাঁর এই দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

বাবু প্রমথনাথ দেব, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতি ধনাঢ্য লোক ও অপর সাধারণ হিন্দুগণ ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ে এক সভা করিয়াছিলেন, ঐ কার্য নির্বাহ নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা পত্র আনীত হইয়াছিল।"

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমোহন ঠাকুর যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে স্বধর্মে ফিরে আসেন, এবং তৎসংক্রান্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই সভা 'বহু বৎসর পর্যন্ত' বলে উল্লেখ আছে। ঐ সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ "হিন্দুশাস্ত্রে যখন সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, তখন স্বধর্ম ত্যাগীর প্রায়শ্চিত্ত নাই এ কথা কে বলিবেন ?" নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে চন্দ্রমোহন ঠাকুর "প্রথম দিবস মস্তকমুণ্ডন পূর্বক শুদ্ধ ঘৃতাহার করিয়াছিলেন, পরদিবস তিনি ১২৮০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও পিতৃপুরুষাদিগের শ্রাদ্ধাদি করেন, তৎপর দিবস তাঁহার পরিবারেরা তাঁহাকে স্বজাতি সমাজে গ্রহণ পূর্বক তাঁহার সহিত একত্র ভোজনাদি করিয়াছিলেন, এই বিধান হিন্দুশাস্ত্র সম্মত।"—মধুসূদনের পক্ষে এ জাতীয় সর্তে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করা কখনই সম্ভব ছিল না।

পৃঃ ৯৭॥ "বিশপ্‌স্ কলেজ" সম্বন্ধে উলিয়ম্ য়্যাডাম্-এর ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মূল্যবানঃ গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্ বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের পূর্বদিকে ২৬ বিঘা জমি কলেজের গৃহ ও প্রাঙ্গণের জন্য দান করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মযাজকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে কার্যনির্বাহের জন্য উপযুক্ত করা। ধর্মশাস্ত্র এবং তার সম্যক প্রয়োজনে হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তদ্ব্যতীত প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রের উপযুক্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল। এ শিক্ষাপ্রণালী ইংলণ্ডের কলেজীয় শিক্ষার অনুগামী ছিল। ইংরাজি কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করা হত। সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি সুযোগ অনুসারে প্রাক্তন

মাদ্রাজী ছাত্রেরা শেখাতেন। প্রাত্যহিক অধ্যাপনার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অধ্যাপকগণ অধ্যক্ষকে প্রতিদিন দিতেন। মাঝে মাঝে কলেজ 'হল্'-এ প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এই সকল অনুষ্ঠানে পরিদর্শক প্রধান আসন গ্রহণ করতেন। —অতএব বিশপস্ কলেজে মধুসূদন যে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা ভারতের অন্যত্র কোথাও সে-যুগে ছিল না।

পৃঃ ১২১॥ "ইতিমধ্যে আর একটি গোষ্ঠী" ইত্যাদি: শ্রীবিনয় ঘোষ সঙ্কলিত "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র" গ্রন্থে এপ্রিল ১৮৪৯ সালে 'বঙ্গ হইতে প্রাপ্ত' একটি সুদীর্ঘ আলোচনাপত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় তা পাঠকের নিকট অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে না। অপরপক্ষে আধুনিক কালের ভাষা সমস্যা নিয়ে তর্কাতর্কির পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য আছে বলে কিয়দংশ উদ্ধার করে দিলাম: "আমারদিগের প্রথম বক্তব্য এই বঙ্গভাষা সুচারু রূপে প্রচলনের তাদৃশ জ্ঞানদ পুস্তক নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে, এতদ্ভাষার দ্বাদশ খান জ্ঞানদ পুস্তক সংগ্রহ করা কঠিন হয়, কিন্তু এই উত্তম পুস্তকই বা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? এই সকল পুস্তক ইংলণ্ডীয় ভাষা হইতে অনুবাদ ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এতাদৃশ গুরুভার কাহার প্রতি অর্পণ করা যাইতে পারে, সাহেবদিকের এ কর্ম নহে, ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অথচ বঙ্গভাষায়ও পণ্ডিত এমত ব্যক্তিকেই এ ভার অর্পিতে পারে, কিন্তু এমত ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া সাধারণ নহে আমরা জানি এক ব্যক্তিকেই এই কর্ম যোগ্য হইতে পারে, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুনিপুণ। অতএব এডুকেশন কৌন্সিলের এইক্ষণে এই আবশ্যক যে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় কোনও পুস্তক অনুবাদ করিতে হইলে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়।...

"আমরা এই স্থানে আমাদের দেশহিতৈষী তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে বিশেষ নিবেদন করি, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাকে ম্রিয়মানাবস্থা হইতে পুনর্জীবিত করিতে বাঞ্ছা করেন তবে শ্রীযুত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহারদিগের লেখক মধ্যে মনোনীত করুন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ লিখিত হয় তাহা জ্ঞাত হইবেন, নচেৎ বিলাতী বাঙ্গালা ব্যবহার করিলে কেবল ভাষাকে বধ করা হয়। অতএব বঙ্গভাষাকে পুনরুজ্জ্বল করা সর্বসাধারণের পক্ষে কর্তব্য হইয়াছে। অতএব জরাগ্রস্তা জননীর সেবা করিতে ঘৃণা করা পুত্রের কর্ম নয়, শুশ্রূষা দ্বারা যাহাতে তিনি পূর্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েন তাহার যত্ন করাই কর্তব্য।"—

—এ সম্বন্ধে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত সংবাদ প্রভাকরে যে সমস্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং সাধারণ আলোচনা মুদ্রিত হয়েছিল, তা থেকে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানতে পারি। দ্রষ্টব্য, শ্রীবিনয় ঘোষ প্রণীত "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র," প্রথম খণ্ড।

পৃঃ ১৩৪ ॥ "মধুসূদন গির্জা যাওয়া ত্যাগ করেছেন": রেভঃ যোসেফ্ প্রাণনাথ বিশ্বাস তাঁর ইংরাজিতে লিখিত মাইকেল সম্বন্ধে স্মৃতি-কথায় লিখেছেন: "Michael Dutt's Christian friends diffred from him because of his peculiar views on Churchmanship. Michael believed that there was no special spiritual benefit in joining any particular church: in his eyes all the Churches were the same and he thought he might attend divine worship whereever it pleased him."

পৃঃ ১৪৫ ॥ "ডিভোর্স-এর মামলা" ইত্যাদি : কলিকাতা ও মাদ্রাজের লর্ড বিশপ্-এর দপ্তর হইতে প্রাপ্ত দুইখানি পত্র দ্রষ্টব্য :

(১)

Bishop's House
Calcutta, 16
22nd June 1960.

Dear Sir,

Thank you for your letter of the 19th June 1960. We have searched our records and unfortunately we could not find Michael Madhusudan Dutt's marriage. I presume his marriage with Rebecca Mactavich might have taken place in Madras and I should request you to write to the Right Reverend the Bishop in Madras, Diocesan Office, Cathedral Post Office, Madras 6. He may be able to give you certain information about his marriage. You can at the same time write to him to find out whether there was a divorce of marriage and also if he knows anything or not about Michael Madhusudan Dutt's marriage with Henrietta.…I am sorry I cannot give you any more information on this subject. I wish I could.

Yours sincerely
Sd/ (S. B. Paul)
for Metropolitan's Chaplain 23/6

Prof. D. N. Ghosh
13/1 Ritchie Road
Calcutta 19.
19th July, 1960.

(২)

The Diocesan Office,
Post Box No. 702,
Cathedral P. O.
Madras—6.

Dear Sir,

The information you ask for is unfortunatly not available with us. The relevant papers may have been among those destroyed during the "Evacuation."

Yours faithfully,
Sd/ G. S. Frederich
P. A. to the Bishop in
Madras.

D. N. Ghosh, Esq.,
Professor,
13/1 Ritchie Road,
Calcutta 16.

নগেন্দ্রনাথ সোম যে সময়ে মাদ্রাজের ঘটনাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, তখন নিশ্চয় নথিপত্র ছিল। মধুসূদনের বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ ছিল। অতএব এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য থাকলে তিনি নিশ্চয় জানতে পারতেন।

(খ)

গ্রন্থ-তালিকা।

জীবনচরিত ও জীবনী আলোচনা

১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত : যোগেন্দ্রনাথ বসু (দুষ্প্রাপ্য)।

২। মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম (গুরুদাস)

৩। মধুসূদনের অন্তর্জীবন : শশাঙ্কমোহন সেন

৪। মধুসূদন দত্ত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [সাহিত্যসাধক] (সাহিত্য পরিষদ্)

৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত : প্রমথনাথ বিশী (মিত্রালয়)

৬। মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা : বাণী রায় (গ্রন্থম্)

যুগ-পরিচয়।

৭। সংবাদপত্রে সেকাল, ২য় খণ্ড : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সাহিত্য পরিষদ্)

৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী
(এস্ কে. লাহিড়ী)

৯। সাময়িক সংবাদপত্রে বাঙালী সমাজ : বিনয় ঘোষ (বেঙ্গল)

১০। বিদ্যাসাগর ও বাংলা সমাজ, ১-৩ খণ্ড : বিনয় ঘোষ (বেঙ্গল)

১১। বাংলার নবজাগৃতি : বিনয় ঘোষ (ইণ্টারন্যাশানল্)

১২। সাহিত্যবীক্ষা : নীরেন্দ্রনাথ রায় (ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি)

১৩। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণ : সুশীলকুমার গুপ্ত
(এ মুখার্জি)

১৪। সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ : জীবেন্দ্র সিংহ রায়
(ক্যালকাটা)

১৫। কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র : যোগেশচন্দ্র বাগল (শ্রীগুরু)

১৬। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : যোগেশচন্দ্র বাগল

১৭। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য :
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বুকল্যাণ্ড)

১৮। যুগন্ধর মধুসূদন : সিতাংশু মৈত্র (মডার্ণ বুক্ এজেন্সী)

১৯। Notes on the Bengal Renaissance : Amit Sen
(National Book Agency)

২০। বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : গোপাল হালদার

সমাজ-পরিচয়

২১। পাষণ্ড-পীড়ন : কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (সাহিত্য পরিষদ্)

২২। কলিকাতা কমলালয় : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)

২৩। বাবু বিলাস : ঐ ঐ ঐ

২৪। কবিতাবলী : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (বসুমতী)

২৫। বাঙালীর গান : দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ('বঙ্গবাসী' প্রেস)

২৬। আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাঁদ মিত্র [টেকচাঁদ] (বসুমতী)

২৭। হুতোম প্যাঁচার নক্সা : কালীপ্রসন্ন সিংহ (বসুমতী)

২৮। একেই কি বলে সভ্যতা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সাহিত্য পরিষদ)

২৯। আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু (সাহিত্য পরিষদ)

৩০। কাল প্যাঁচার নক্সা : "কালপেঁচা" (বিহার সাহিত্য ভবন)

ব্যক্তি-পরিচয়

৩১। ডিরোজিও : বিনয় ঘোষ (বেঙ্গল)

৩২। ভূদেব মুখোপাধ্যায় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক : পরিষদ্)

৩৩। প্যারীচাঁদ মিত্র : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক : পরিষদ্)

৩৪। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ : ঐ ঐ ঐ

৩৫। রাধাকান্ত দেব : ঐ ঐ ঐ

৩৬। কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র : মন্মথনাথ ঘোষ (গ্রন্থকার)

৩৭। মনীষী ভোলানাথ চন্দ : ঐ ঐ ঐ

৩৮। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় : ঐ ঐ ঐ

৩৯। মহাকবি রঙ্গলাল : শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থকার)

৪০। Presidency College Register (1927)

অন্যান্য পুস্তক

৪১। যশোহর-খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র (চক্রবর্তী চ্যাটার্জি)

৪২। প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় : হরিহর শেঠ (ওরিয়েণ্ট)

৪৩। Wm. Adam's Report on Education, ed. Anathnath Bose (Cal. Uni.)

৪৪। মধুসূদনের কবি মানস : শিশির দাস (বুক্‌ল্যাণ্ড)

বিষয় নির্দেশিকা